অক্লান্ত কৌরব

মহাশ্বেতা দেবী

নবপত্র প্রকাশন / কলিকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৫৯
১৫ই এপ্রিল, ১৯৫২

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

যারা মাটির মানুষের জন্য তাদের সঙ্গে থেকে লড়ছে
সেই সব অনামা কর্মীদের—

সালে খর। জুত করে চেপে বসতে না বসতে বৃষ্টি নামে জাগুলাতে। জাগুল এখন শান্ত, শান্ত। এ শান্তি অগ্নিগর্ভ না সত্যিই শান্ত অবস্থার পরিচয় তা জানা যায় নি।

জগুলায় আসার আগে দ্বৈপায়ন সরকার সব খবর নিয়ে নিয়েছিল। যদিও সে এক পৌঢ় রিসার্চ স্কলার এবং বাম রাজনীতির ডান বগলের স্থায়ী বাসিন্দা। তবু তার মস্তিষ্ককোষ খুঁটেখুঁটে তুলে নিয়ে গেছে যেন কোন্ লুটেরা এবং চিন্তাকোষে বসিয়ে দিয়ে গেছে অদেখা সব নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি। ফলে বাইরে তার চেহারা একরকমই আছে। কিন্তু মাথায় ফেরে অদ্ভুত সব চিন্তা। লুটেরারা এ দেশে বহু মস্তিষ্ককোষ এ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আজকাল। ফলে নিয়ন্ত্রিত মানুষটি দেশ ও দেশের মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর সব চিন্তা করে, কাজ করে এবং তার পরেও নিজেকে সৎ ও বিবেকী মনে করে। সবই হয় লুটেরাদের ইচ্ছেমতো। লুটেরাদের একমাত্র উদ্দেশ্য সহিংস ও সশস্ত্র প্রতিবাদ শোষিত শিবিরে যেন আবার না দেখা দেয়। সহিংস ও সশস্ত্র হবার অধিকার যেন একমাত্র শাসকের থাকে।

দ্বৈপায়ন সরকারের বয়স ষাট, চেহারা পাতলা, বুদ্ধি উজ্জ্বল, সে পেছনে রেখে এসেছে এক রক্তাক্ত অতীত এবং তা মুছে ফেলার জন্যেই সে এখন অহিংসা, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, ইত্যাদি ইত্যাদির পঞ্চরঙ্গী প্রোগ্রামে দীক্ষিত।

গবেষণার বিষয়টির কারণেই তার জাগুলা আগমন। সহসা বস্তুত ধর্মপূজার মেলার হুজুগে দ্বৈপায়নের সহসা আগমন চোখেই পড়ত না কারো। হঠাৎ মাতো ডোম ভূতের ভয় না পেলে।

মাতো রিকশাটি পাঁই পাঁই করে টেনে চালায় ও চিরকালের

অভ্যেস মতো রিকশার আলো জ্বালে না। লালমোহন কনস্টেবল তাকে থানার সামনে থানায় এবং বাতিছুট রিকশা চালাবার জন্যে 'সালার বহোত্ গরম বঢ়েছে' বলে মাতোর পকেটে খাবল মারতে চেষ্টা করে। পয়সার বদলে ধর্মঠাকুরের ঢ্যাবা মাতুলি পেয়ে বেজায় ক্ষেপে লালমোহন চেঁচায়। বচসা থামাতে দেওকী মিশির বেরিয়ে দু জনকে ধমকায় এবং মাতো বলে, ভুত দেখে পালালাম, তাথে বাতি জ্বালতে মনে নাই।

ভূত ?

লিজ্যস্ ভূত।

কুথা ?

কালীবাবুর আপিস ঘরে।

আঁ ? কি বলিস ?

বাবুটো, কালীবাবুটো তো মরি গিছু কভে, তার কাগজের আপিস ঘরটো বন্ধ থাকে। তা সেথা দেখি সে বসে আছে বাতি, জ্বেলে। দেখে আমু ডর্যে গেলম।

এখন দেওকী মিশির বড়ই রেগে ওঠে ও বলে, মরি গিছে ? কালীবাবু ?

হাঁ বাবু।

শালো, তবে থানার দেয়ালে তার ছবি থাকে কেনি ? খোঁজ নাই তার, জান না ? মরি গিছে !

মদের নেশা ও প্রেত ভয়ে বিবশ মাতো বলে, বেঁচে সি নাই, মরি গিছে।—কেঁদে ফেলে ও, ভালো লোকটারে মারি দিলে বাবু, আর তার পরিবাররে পাতকী করলে ?

কি বলিস তু ?

সভে জানি গিছে। বসাই টুডুরে সাঁঝাতে চরসার বনে সাঁধাল পুলুস, বাপরে মেলেটারি ! কালীবাবু ভি ছিল, আর বসাইরে না পেয়্যে তারে মারি জঙ্গলে ফেলাল। বেতুল কাওরা যেয়ে হাড়গুলান

চাদরে বেন্ধে আনতেছিল, তারে ভি মারি দিছ। ই সকল বেত্তান্ত হাটে-মেলায় রটি গিছে—তুমু আর থানাবাবু কত ছুটালে তখুন। তা বাদে সামন্তবাবু কি বা বুদ্ধি দিল, কালীবাবুর ছবি রাখি দিছ আর রটাই দিছ যি সি জীন্দা এখুনো, সাঁধান নাই! আর তার পরিবাররে ভি তাই বুঝাছ, তাথেই সিজনা সিন্দুর মুছে না, লোহা খুলে না। কালীবাবুরে তুমরা মারা করাছ, লয়?

মদ খেয়্যে তু পাগল হলি? ই কথা বললে তুরে ভি গারদে রাখি দিবে।

গতিগঙ্গা পায় নাই, তাতেই মরা মানুষটো এসে বসাছে ঘরে। আমি দেখলাম।

ভুল করছিস বাপ।

দেওকী মিশির অতি বিপন্ন হয়ে মাতোকে 'বাপ' বলে।

কালী সাঁতরাকে ১৯১৯ সালে বসাই টুডু অপারেশনে চরসার জঙ্গলে পুলিশ মেরে ফেলে ও জঙ্গলে ফেলে দেয় লাশ। মাসখানেক বাদে বেতুল কাওরা তার হাড়গোড়, চশমা ও গলিত চটি উদ্ধার করে চাদরে বেঁধে নিয়ে আসে এবং থানায় তা দাখিল করে কালীর মৃত্যু নিয়ে যথেষ্ট কাঁদে হো হো শব্দে। পরিণামে তাকেও মরতে হয়। এ-সব কথাই সত্যি এবং কোনো ঘটনাই সামন্ত বা এস আই বা দেওকীর অজানা নয়। তাই কালী সাঁতরার ছবি টাঙিয়ে তাকে 'মিসিং' বলে ঘোষণা করা হয়। কালীর বউ গিনিমালাকে সধবার সাজে থাকতে বলা হয়, ইত্যাদি। দেওকী এখন এ-সব কথার আলোচনা চায় না। তাই সে মাতোকে বলে, বাড়ি যা বাপ। উ একটো বাবু। কি কাজে এসেছে। কালীবাবুর কাগজ দেখতেছে বসে, তাথেই ডর্যে গিছিস তু। কালীবাবুর খবর জানলে দিলে পরে বখশিস।

মাতো চোখ মোছে। মাথা নেড়ে বলে, না বাবু উ কাম আর করি না। বাবা এখুন মোর সাথ কথা বলে। বাবার নিষেদ

আছে। থানায় খবর ভি দিব না, টাকা ভি লিব না।

রতন কি বলে ?

বলে উ গু-খুয়া কাম করলি, টাকা ভি পাস নাই, বাসে চাকরি ভি হয় নাই তুর—আর যাবি না।

তবে তো ভালোই। ঘরকে যা। রতন কুথা ?

ঘরে।

কি করে এখুন ?

আমি জানি ?

মাতো চলে যায়। দেওকী মিশির মাথা নাড়ে। ছোটলোক-দের বাড় বেড়েছে খুব। খোচরের কাজ করতে চায় না মাতো। একদিন করত। রতন, ওর বাপ নিশ্চয় বুদ্ধি দিচ্ছে।

লালমোহন কনস্টেবল দেওকীর সঙ্গে ঘরে এসে বসে। তারপর বলে, মেলাতে কথা হল খুব। মিশিরজী! ধরমরাজের মেলাতে তোলা তো হাম লোগ লিয়া করি। তা ইন্দরবাবু বহোত বলছে সবাকে, কেউ দিল না। ইন্দরবাবু কা, পারটি কা কাম না করতা ?

কে ? ইন্দ্র প্রামাণিক ? সে হেথা ?

হাঁ মিশিরজী।

দেওকী মিশির বলে, বুঝি নিলাম সব। তু যা বাবু।—মনে মনে প্রমাদ গণে সে। 'ইন্দ্র প্রামাণিক' নামটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর। রাজনীতির খেলায় সব বেচাকেনা-কেনাবেচা-ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে যাবার পর ইন্দ্র প্রামাণিকের মতো একজন যুবক সকলের পক্ষেই অস্বস্তির। পার্টির পক্ষেও। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র যেমন চলছে, জাগুলাতেও তাই। জাগুলাতে যা যা ঘটছে, সেই মানচিত্রটি ভালো করে বুঝলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে মোটামুটি বোঝা যাবে। এই ভয়ংকর রকম জটিল অথবা অতীব সরল মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক পার্টির পক্ষে ইন্দ্র প্রামাণিকের মতো রক্তের প্রতি কণায় সৎ ও সংগ্রামী ক্যাডার এক জঞ্জাল। স্থানীয়

জনপ্রতিনিধি সামন্তের পক্ষেও। দেওকী মিশিরের পক্ষে তো বটেই। সামন্ত এবং সামন্তজাতীয় পার্টির লোকদের কাছে আজ ইন্দ্র প্রামাণিকের চেয়ে দেওকী মিশির অনেক দরকারি, অনেক নির্ভরযোগ্য। বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে দেওকী বা এস আই নিশ্চয় ইন্দ্রর পায়ের নখের যোগ্য নয়। কিন্তু পার্টি নেতৃত্বের কাছে আজ ইন্দ্রের মতো ক্যাডারের চেয়ে থানা পুলিশ অনেক বেশি দরকারি। পুলিশকে তোয়াজ করা নিয়েই ইন্দ্র এবং সামন্তর এক ঐতিহাসিক কাটাকাটি হয়। সামন্ত সেদিন অত্যন্ত তেতে বলেছিল, কালী সাঁতরা গেল—তুমি এলে। বিবেকের ভূমিকা দেখছি এখন তোমার।

কালীদার নাম আপনি উচ্চারণ করবেন না।

কেন, যোগ্য নই ?

না। পার্টির ইমেজ আপনাদের কল্যাণে বহুদিন থেকেই পচতে বসেছে। সে জন্যেই কালীদাকে বিবেকের ভার বইতে হত। আমাকে আপনি কালী সাঁতরার সঙ্গে এক করবেন না। তার পায়ের ধুলোর যুগ্যি আমি নই।

বাড়াবাড়ি কোরো না।

পার্টির ছেলেদের মারে নি পুলিশ ? মিশির শুধু নকসাল মেরেছিল ? পঁচাত্তরে কতগুলো ছেলে মেরেছিল ? সেই পুলিশকে মদত দিচ্ছেন। 'বাবা-বাছা-ভাই' বলছেন, ব্যাপারটা কি ?

কালী ছিল একরকম, তুমি দেখছি···

কালী 'ছিল' বলছেন, তখন বললেন 'কালী গেল'—কালীদাকে কি করেছেন আপনারা সামন্তদা ? কি করেছেন তা নিয়ে সবাই যা বলছে তবে তাই সত্যি ? কার ডিসিশানে সামন্তদা, কার ডিসিশানে ?

সামন্ত উঠে চলে গিয়েছিল চেয়ার থেকে। ভীষণ, ভীষণ অস্বস্তি। কালী সাঁতরা যে নিরুদ্দেশ, তার যে খোঁজ চলছে, সে কথাটা কেউ বিশ্বাস করে না, ইন্দ্রও বিশ্বাস করে না। বেজায় ক্ষেপে সামন্ত

কালীর ছেলে অনির্বাণকে ডেকে পাঠিয়েছিল এবং তার বিখ্যাত ছেঁড়ে গলায় বলেছিল, ব্যাপারটা কি ?

কেন সামন্ত কাকা ?

বাপ নিরুদ্দেশ হয়েছে বলে মাঝে মধ্যে কাগজে বিজ্ঞাপন তো দিতে পার। সে কাজ কি আমার ?

কালী সাঁতরার প্রতি তার ছেলের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। তবু কালীর বিষয়ে সকল বাজারি খবর তারও জানা। সে বলে, মা বারণ করল। আমারও মনে হয় না লাভ হবে।

তোমার স্ত্রী কলকাতায় চাকরি নিল ?

হ্যাঁ।

অনির্বাণ উসখুস্ করেও বলে, মা বলছে এখানকার বাড়ি, জমি, সব বেচেবুচে দিতে।

কেন ?

কলকাতা চলে যাব।

সামন্ত হঠাৎ বোঝে কালী যে নিহত তা কালীর বউ এবং ছেলে ভালোভাবেই জানে। ওরা চলে যাচ্ছে মানে ভয় পেয়েছে।

যা ইচ্ছে করো গিয়ে। ইন্দ্র, ইন্দ্র কিছু বলেছে ?

অনির্বাণ হঠাৎ সামন্তকে অপ্রস্তুতে ফেলে কেঁদে ফেলে ও চোখ মুছে বলে, বাবাকে অবহেলা করতাম, মূল্য বুঝি নি, এইসব বলে যখন-তখন যা তা বলে কতজন। মা শাঁখা সিঁদুর ফেলে নি বলেও কতজন কত কি বলেছে, সামাজিক নেমন্তন্নও করে না। একটা সরকারি রিপোর্টও যদি করিয়ে দিতেন সে সময়ে। সবাই বলে বাবাকে মেরে ফেলেছে, আপনারা বলেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে— আমরা কি করব ? বেতুলকেও···বেতুল চশমাটা পেয়েছিল, সেটা তো প্রমাণ। তা যদি আমাকে দিতেন, তখনি রিপোর্ট বের করে দিতেন, আমরা এ অপমানে পড়তাম না।

তুমি বুঝছ না···

মা কলকাতা গিয়ে গেরুয়া পরবে। বারো বছর বাদে থান নেবে। আমরা চলে যাচ্ছি সামন্ত কাকা।

কালী যে নেই, তার প্রমাণ না পেতেই ধরে নেব সে নেই ? তা কি করে হয় ?

নিরুদ্দেশ বললেন যে ? তাতেই অবিশ্বাস করল সবাই। বেতুলও মারা পড়ল। বাবা জাগুলা ছেড়ে কোথাও যেত না কখনো, বাড়ি আর 'জিলাবার্তা' আপিস, কারো অনিষ্ট করে নি কখনো···

অনির্বাণ চলে যায়। সামন্ত চেঁচিয়ে বলে, এখন তো খুব 'বাবা বাবা' বলছ। বাড়িতে কি হেনস্থা করতে সবাই জানে।

অনির্বাণ আর কিছু বলে না।

কালীর ব্যাপারটি খুব গণ্ডগোল করে ফেলেছে তা সামন্তও বোঝে। এখন কালী সাঁতরা হত্যার এতদিন বাদে কি করে সরকারি ভাবে 'কালী মৃত' তা বলা যায় ? আগে কেন এ-সব কথা মনে হয় নি ? অনির্বাণরা কলকাতায় যাবে, যাক ! অনির্বাণকে ভালোমতো রগড়ে দিতে হবে। বাপের মৃত্যু নিয়ে বেফাঁস কথা যেন না বলে। কলকাতা তো জাগুলা নয়। শাসক দলের বয়স্ক এক নির্বাচিত নেতা হিসেবে সামন্ত জাগুলাতে সকলকে চেপে রাখতে পারে। কলকাতায় তা সম্ভব নয়। রাজনীতিক বিরোধী প্রতিপক্ষকে জাগুলাতে ভয় পায় না সামন্ত। জাগুলা শহরটি গোপন সমঝোতায় তাদের সঙ্গে ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছে সে। বস্তুত, শহরটি এখন তাদের গুণ্ডা-মস্তান-ঠিকাদার-বাটপাড়-ব্যবসায়ীদের দখলে। সবাই এ রেজিমে বেজায় খুশি। যথেচ্ছ মুনাফা লোটা চলছে, যথেচ্ছ মস্তানি চলছে, যথেচ্ছ দাম বাড়ানো চলছে, কালোবাজারীর ঢালাও কারবার চলছে, এর পরেও এ রেজিমের পতন কে চাইবে, কেন চাইবে, সামন্ত ভেবে পায় না।

প্রতিপক্ষ নির্ভরযোগ্য।

ইন্দ্র নির্ভরযোগ্য নয়।

অনির্বাণ পালাবে। অনির্বাণ চুপ করে থাকবে। ইন্দ্র, ইন্দ্র কেন সন্দেহ করছে কালীর খবরটা সত্যি নয়?

সামন্ত মাথা নাড়ল বারবার। হতভাগা বজ্জাত ইন্দ্র। এমন কাণ্ড জুড়ে দেয় সামন্ত বারবার না এলে, যে বাধ্য হয়ে কলকাতা ছেড়ে সামন্তকে জাগুলা আসতে হয়। ভোট নেবার সময়ে তো যাবেই সামন্ত সর্বত্র। খরার সময়ে, বন্যার সময়ে, সব সময়ে আসতে বাধ্য করছে ইন্দ্র।

ব্যাটাকে 'কালী সাঁতরা' করে দেওয়াও সম্ভব নয়। বিশাল প্রতিপত্তি ওর গণভিত্তিক পর্যায়ে।

এই সব সমস্যায় সামন্ত যখন প্রপীড়িত, তখন হঠাৎ হুড়কো এল, দ্বৈপায়ন সরকার যাচ্ছে গবেষণার কাজে। বিশ্বাসযোগ্য পার্টি ক্যাডার সঙ্গে দিয়ে তাকে পাঠাতে হবে গ্রামে গ্রামে। ক্যাডার যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়।

সামন্ত তখনি 'ইন্দ্র প্রামাণিকের ব্যবস্থা হল' ভেবে উৎফুল্ল হল।

ইন্দ্র বড়ই গোল পাকাচ্ছে।

দ্বৈপায়ন সরকার কে?

দ্বৈপায়ন সরকারের বয়েস এখন ষাট। যদিও দেখলে তা বোঝা কঠিন। ছিপছিপে চেহারা, শক্ত এবং ডাঁটো। মাথার চুল কাঁচা-পাকা মেশানো। মুখ বৈশিষ্ট্যহীন, রঙ ফর্সা, চোখ ঝকঝকে। বহুকাল কম্যুনিস্ট পার্টি করছে, পার্টি ভাগ হবার পর থেকে সে ডাইনে থেকে যায়। তার পার্টির অত্যন্ত ক্ষণিক ভাঙচুরে দ্বৈপায়ন এই দক্ষিণপন্থী বাম পার্টির দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ রকম হবে তা জানা ছিল। কেন না দিল্লীর খুঁটির জোরেই ওর লড়ালড়ি।

যে বিদেশী শক্তি দীর্ঘকাল ধরে ভারত সরকারের সাগ্রহ সহ-

যোগিতায় এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করছে, সে শক্তি শুধু ভারতীয় শ্রমে ও কাঁচামালে তৈরি জিনিস বাণিজ্যিক চুক্তির নলচের আড়ালে কম দামে কেনে না। ভারতীয় মগজেও স্থাপন করে উপনিবেশ। তাদের মদতপ্রাপ্ত গবেষণা সংস্থায় সামিল হয় দেশের তরুণ বুদ্ধিজীবীর দল। অগাধ টাকা। অপার সময়। রিসার্চের বিষয়বস্তু ভালো ভালো। যেমন আদিবাসী, গরিব কৃষক, ক্ষেতমজুর, শিল্প-শ্রমিক, গ্রামীণ কারিগর, লোকশিল্পী, এদের জীবন ও কাজকেন্দ্রিক। হিংসার রাজনীতিতেও এদের প্রভূত আগ্রহ কিন্তু যেহেতু মগজে উপনিবেশের খুঁটি, সেহেতু রিসার্চের থিসিস ও প্রবন্ধগুলির মধ্যে সংগ্রামী ভারত, শোষিত ভারত, শ্রমজীবী ভারতের প্রতি সমব্যথার কুম্ভীরাশ্রুর আড়ালে থাকে অন্য উদ্দেশ্য। গালভারি কথা, পরিসংখ্যান সারণি ইত্যাদির যোগফলটি মারাত্মক। এই যোগফলের বাণীরূপ এইরকম, 'হে ভারতীয় মানুষ! কখনো স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে হাতিয়ার তুলো না। কখনো বর্ণাশ্রমীয় প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা উল্টাতে চেও না। জোতদারের হাতে বেনাম জমি থাকুক। কৃষিতে তুমি অনুন্নত? উন্নত প্রথায় চাষ করছ না বলে এ অনুন্নতি। শিল্পপতি লুটে চলুক মুনাফা। শ্রমিকদের জন্য দরকার উন্নত উপায়ে উৎপাদনী যন্ত্রপাতি।'—এ-সব থিসিসে ভারতের কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে, যেখানে এখন লক্ষকোটি মানুষের দু-হাত শ্রম করে কোনোমতে বেঁচে আছে, সে সব ক্ষেত্রে যন্ত্রনির্ভরতা এনে দেয়ার কথাও বলা হয়। এর ফলে লক্ষকোটি নিরন্ন মানুষ কর্মহীন হবে, তা বলা হয় না। এই ভারতে, ভারতীয় মগজ কিনে নিয়ে তাতে এ ধরনের চিন্তাধারার বীজ বপন করে দ্বিতীয় বিদেশী শক্তিও। প্রথম দলের ক্ষমতা অনেক বেশি। তারা কাজ করে নীরবে, চতুরতায়। বহু বছরের চেষ্টায় শিক্ষা ও সংস্কৃতিজগতে তাদের খরিদ করা শেয়ারই বেশি। দেশজোড়া প্রকল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতিজগৎ, সর্বত্র তাদের লোকজন। এ-সব লোকজনেরও পোয়াবারো। প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের হলুদ

টাকাও তারা নেয়, তারাও ছোটে মার্কিন মুলুক। একই লোক, একই সংস্থা বা প্রকাশনা বা পত্রিকা একই সঙ্গে লাল হলুদ টাকা পেটে এমন নজীরও অনেক আছে।

দ্বৈপায়ন এই সব বুদ্ধিজীবীর মধ্যেও কুলীন। চিরকেলে কম্যুনিস্ট ও, এবং মাঝে মাঝেই ও আদিবাসীদের বিষয়ে প্রবন্ধ ক্ষেপণ করে। প্রবন্ধ লেখার জন্যে, জানা যায়, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ ওকে টাকা দেয়। সব খবর সর্বজ্ঞ পাবলিক জানে না তাই কেউ জিগ্যেস করে নি। এ-সব টাকা সত্যি সত্যি কে দিচ্ছে? কেউ প্রশ্ন তোলে নি, ইতালি বা বেলজিয়াম বা হল্যাণ্ড বা পশ্চিম জার্মানী বা নরওয়ে বা সুইডেন ভারতের ওঁরাওঁ, মিকির, হো, নাগেসিয়া, কোলতা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখাতে এত উৎসাহী কেন?

দ্বৈপায়ন জাগুলা এসেছে সাঁওতালদের সঙ্গে, এক বিশেষ ধরনের সাঁওতালদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। উদ্দেশ্য সুদূরপ্রসারী। পশ্চিমবঙ্গে যখন আসে ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সাল, দ্বৈপায়ন তখন কলকাতার বাইরে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে অগাধ বিদেশী টাকায় সাঁওতাল গ্রামীণ সমাজে বিবাহ ও বিবাহিত জীবন বিষয়ে ব্যক্তি ও সমাজের মনোভঙ্গি নিয়ে এক গূঢ় সমীক্ষা চালাচ্ছিল। ওর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, সাঁওতাল সমাজে বিবাহের আর সে পবিত্রতা নেই। কিন্তু সময়টি মন্দ ছিল। সাঁওতাল গ্রামে গ্রামে তখন অন্য স্পন্দন মাদলে অন্য বাজনা। সাঁওতালদেব এক বিয়ে দেখতেই পায় দ্বৈপায়ন। উৎসবে নাচ ও গান খুব লড়াকু মেজাজের দেখে অবাক হয়। ওকে অতীব বিস্ময়ে ফেলে একটি বৃদ্ধ সাঁওতাল বলে, অমুক জোতদারের মাথাটো গিরাই দিল তারা, আনন্দ করি আমরা বেটেক।

দ্বৈপায়ন তাড়াতাড়ি সরে পড়ে। ফিরে এসে অচিরে পায় এক উড়ো চিঠি। সাঁওতাল সমাজ নিয়ে অপপ্রচারের উদ্দেশ্যে যে সমীক্ষা চালাচ্ছ, সেটি বন্ধ করে ছেঁটে না পড়লে গোলক তফাদার হয়ে যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ভরসা দেন, দ্বৈপায়ন ভরসা পায় নি। সে ছেঁটে পড়ে সেখান থেকে, চলে যায় দিল্লী, নিজের রাজনীতিক দলের কাগজে মদত দেয়, বীরভূমের নকসালবান্ধব সাজে এবং অন্ধ্রে নকশাল দমননীতির প্রতিবাদে বেজায় হইচই তোলে। সাঁওতাল সমাজে বিবাহিত জীবন এখন বিপর্যস্ত, মূল্যবোধহীন, এ কাজটি থাকে অসমাপ্ত।

এতকাল বাদে আবার সে ফিরেছে তার প্রাক্তন কর্মক্ষেত্রে। বিশেষ উদ্দেশ্যে। এবার তার থিসিস হল, সে প্রমাণ করবে, আদি-বাসীদের মধ্যে সাঁওতালরা সবচেয়ে ভীরু, কম লড়াকু, এসটাবলিশ-মেনট অনেক সহজে ও সস্তায় এদের কিনে নিতে পারে। এদের তুলনায় মুণ্ডা বা নাগা বা কিছু আদিবাসী উপজাতি অনেক বেশি লড়াকু।

বাঘের ওপর টাগ থাকে, তিমির ওপর তিমিঙ্গিলগিল, ঘোড়ার ওপর ঘোড়ারু। দ্বৈপায়নের ওপর থাকে সানি বজ্রপাণি। প্রাচীন সাম্যবাদী, সাদা চুল, বলিষ্ঠ চেহারা। দীর্ঘকাল এক দামী সংস্থার পরিচালক দিল্লীতে। তার বাড়ি, আপিস ও গাড়ি সবই শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত। মোটা কাচের দেয়ালের এপারে এসে সানি গায়ে রোদ-বৃষ্টিও লাগায় নি আজ চোদ্দ বছর। সূর্যের ওঠা ও ডোবা, চাঁদের উদয়াস্ত, ঝড়বৃষ্টি, খরা, জঙ্গল, গাছপালা, শিশুর হাসি, সোনালি গমের আঁটি মাথায় উত্তরপ্রদেশের কৃষক, পশ্চিমবঙ্গে ভরা বর্ষায় আউশ ধানের শোভা, কলিয়ারিতে শ্রমিক, ঘরপোড়া ছাইয়ের সামনে বেদনায় মূক সদ্যোবিধবা হরিজন রমণী, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলি সানি বজ্রপাণি সিনেমাতেই দেখে নেয়। খবরের কাগজ পড়ার সময় হয় না তার। টেলিভিশনের সংবাদই ভরসা। রঙিন টেলিভিশন ভারতের জনগণের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় তার কাছে সব চেয়ে দরকারি জিনিস। কেন, সে বিষয়ে সে নিজে এক সমীক্ষা করে ফেলেছে। সানি বজ্রপাণি দ্বৈপায়নদের

মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে। সানি বজ্রপাণি পরিচালিত সংস্থার অধীনে আছে আরো বহু সংস্থা। প্রতি সংস্থা বিষয়ে সানির ঢালাও হুকুম—'সংস্থা চালাবার কাজে সব সময়ে নেবে উগ্র বামপন্থা সমর্থক বুদ্ধিজীবী ছেলেদের। ঢালাও মদত দিয়ে রাজধানীতে নিষ্ক্রিয় বসিয়ে রেখে, আলতু-ফালতু কাজে পাঁচ বছর লাগিয়ে রাখো, বিপজ্জনক মানসিকতা কেটে যাবে।' দ্বৈপায়নের মতো বিশ্বাসী লোকজন কখনো এ-সব সংস্থায় সরাসরি থাকে না। তারা থাকে ছড়িয়েছিটিয়ে, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, লেখালেখির জগতে। আর অদ্ভুত সব ফাউণ্ডেশনের মদতে অদ্ভুত সব রিসার্চ করে।

সানি দ্বৈপায়নকে বলেছিল, দেখেছ ?

কি দেখব ?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইচই করে সাঁওতাল বিদ্রোহের একশো পঁচিশ বছর উদ্‌যাপন করছে, নানা ভাবে সাঁওতালদের মদত দিচ্ছে ?

দেখেছি।

এই তো সময়।

কিসের ?

এ-সব কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। সাঁওতালরা বহু লক্ষ। সরকারি মদতে উপকার পাবে সামান্য ক-জন। বাকি সবাই পড়ে আছে, পড়েই থাকবে অন্ধকারে। কিন্তু এই হল সময়।

কিসের, সানি ?

একটা কথা আমার খুব মনে হচ্ছে। সাঁওতালদের উপরে উঠাতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্য আদিবাসীদের অবহেলা করা হচ্ছে। অন্য আদিবাসীদের সে বিষয়ে সচেতন করা দরকার। যাতে আদিবাসীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। আদিবাসীদের মধ্যে সমাজে-সমাজে একতা আছে, এটা ভাঙা দরকার। অন্য আদি-

বাসীদের বোঝানো দরকার দেখ, সরকার তোমাদের জন্যে কিছু করছে না। যত সুযোগ-সুবিধা, সব দিচ্ছে সাঁওতালদের। এ কাজটা করার জন্যে বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে বিভিন্ন লোক দরকার হবে।

আমি আগে এতটা বুঝি নি।

হাজার হলেও পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিকভাবে খুব সচেতন। সাঁওতালরা যেখানে রীতিমতো একটা শক্তি। আজ যদি তারা স্বাধিকার বিষয়ে সচেতন হয়, অন্য আদিবাসী সমাজগুলি তা দেখে এগিয়ে আসে, না না! দুনিয়ার শ্রমজীবী এক হতে পারে। ভারতের আদিবাসীদের এক হওয়া এক ভীষণ ভয়ের ব্যাপার হবে।

সত্যি কথা।

একটা খুব ভালো জিনিস ঘটছে। সাঁওতালদের চাকরি-বাকরি দেয়া হচ্ছে কিছু কিছু। যাদের চাকরি দেয়া হচ্ছে, আমরা আশা করতে পারি, আশা করব, তাদের শ্রেণীবদল ঘটবে। তারা শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ পেয়ে অন্য সমাজে চলে আসবে শ্রেণীগতভাবে। নিজের সমাজের মানুষদের উন্নতির কথা ভাববে না।

যদি ভাবে?

ব্যবস্থা করতে হবে। আরে, কিছু আদিবাসী অফিসার হয়, মন্ত্রী হয়। তাতে তাদের সমাজের মানুষের কোনো ভালো হয়?

তাও বটে।

সাঁওতালদের সঙ্গে অন্য আদিবাসীদের সম্পর্ক খারাপ করা দরকার সে কাজ অন্যরা করুক। তুমি অন্য কাজ করো।

কি?

তুমি প্রমাণ করো, সাঁওতালরা মোটেই লড়াকু নয়। অন্য আদিবাসীরা অনেক বেশি লড়াকু। সাঁওতাল সমাজ, সমস্ত আদিবাসী সমাজগুলিই, সততা, অকপটতা, লড়াকু স্বভাবের জন্যে বিশিষ্ট। তুমি প্রমাণ করো ওরা দুর্বল, মেরুদণ্ডহীন, উচ্চশিক্ষা ও

চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ওদের কেনা যায়।

তাতে কি হবে ?

বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে। বিভেদ। ভারতের আদিবাসী সমাজ যেহেতু সবচেয়ে নির্যাতিত ও শোষিতদের মধ্যে পড়ে। যেহেতু তাদের মধ্যে বিভেদ চাই, ঐক্য চাই না। কৃষিজীবী জনতার ঐক্য ভয়ংকর জিনিস হে—সত্তরের দশকের শিক্ষা ভুলে গেলে চলবে কেন ?

দ্বৈপায়নকে সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। নীরবে সে কাজ চালাতে থাকে। লড়াকু সাঁওতালদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দরকার তার এ কারণেই। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সে আছে, সেখানকার গ্রামীণ সাঁওতালদের মধ্যে ও যেতে চায় না।

এই প্রসঙ্গে কলকাতায় বসে, জনৈক সাংবাদিক বন্ধুর কাছে ও একটা আশ্চর্য কাহিনী শোনে। জাগুলা শহরের আশেপাশের গ্রামে না কি বসাই টুডু নামে এক সাঁওতাল দীর্ঘকাল প্রশাসনের সঙ্গে লড়েছে। পাঁচবার সম্মুখ সংঘর্ষে 'বসাই টুডু মৃত' বলে জানা গেছে।

পাঁচ বার ?

এটাই একটা রূপকথার মতো ব্যাপার। আসলে জানা যায়, প্রথমবার মারা পড়ে অন্য সাঁওতাল। তাকেই 'বসাই' বলে সনাক্ত করা হয় ?

কেন ?

মুখটা ছিল না প্রায়। চেহারার, মানে শরীরের গঠনে মিল একটা ছিলই। তাতেই ভুলটার শুরু। আসল বসাই তখন পালায়। তারপর রামেশ্বর নামে এক প্রবল শক্তিমান জোতদারের সঙ্গে লড়তে গিয়ে আসল বসাই মারা যায়। ততদিনে 'বসাই' ওর যোদ্ধাদের কাছে অত্যন্ত দরকারি হয়ে উঠেছে। তারপর বাকুলি গ্রামে এক সংঘর্ষে আরেকটি সাঁওতাল নেতৃত্ব দেয় 'বসাই টুডু' নামে,

মারা পড়ে। ব্যাপারটা বুঝলে? 'বসাই টুডু' নামটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে সে নামটিকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। চতুর্থবার কদমখুঞা গ্রামে একটি তরুণ সাঁওতাল ছেলে 'বসাই টুডু' নামে নেতৃত্ব দেয়, মারা পড়ে। পঞ্চম বার পিয়াসোল গ্রামের কুখ্যাত জোতদারকে মারার সময়ে আরেকটি কুড়ি বছরের ছেলে 'বসাই টুডু' নামে নেতৃত্ব দেয়, আহত হয়, জঙ্গলে এসে মরে।

তারপর?

বেশ কিছুকাল 'বসাই টুডু' নামটি শোনা যায় নি। এখন অবস্থা অবশ্য অন্যরকম। কালী সাঁতরা নেই, সে থাকলে তোমাকে সব বলতে পারত।

কালী সাঁতরা কে?

জাগুলার সি পি এম কর্মী। 'জিলাবার্তা' নামে কাগজ চালাত। বসাইকে জানত।

কালী সাঁতরা 'নেই' মানে?

'অপারেশন বসাই টুডুর' পঞ্চম পর্যায়ে কালী সাঁতরা লুকিয়ে নিজে বসাইকে দেখতে গিয়েছিল। সেই থেকে তার আর খোঁজ নেই। তখনকার কথা যদ্দুর মনে হয়, বোধহয় কালী সাঁতরাকে মেরে ফেলা হয়। কিন্তু সে কথা সরকারি স্বীকৃতি পায় নি। কেন পায় নি বলতে পারব না।

আশ্চর্য তো।

তুমি হঠাৎ সংগ্রামী সাঁওতাল কৃষকদের নিয়ে ইতিহাস লিখছ কেন হে? না কি, অন্য ধান্দা করছ, আমাকে ধাপ্পা দিলে? তুমি তো বাপু গভীর জলের মাছ। কি কর না কর, হরদম বিদেশ যাও। মস্কো গেলে তো বুঝতাম, যাও সর্বস্তুর। রাজনীতি থেকে কি কেরিয়ারটা না বাগালে। এমন জানলে রাজনীতি করতাম।

কি যে বলো! রাজনীতি করার সঙ্গে কেরিয়ারের কি আছে? সাংবাদিক হয়ে তোমরা কি মন্দ আছ?

রাজনীতি, মানে তোমাদের রাজনীতি আজ কেরিয়ার ভাই। ক্যাডারগুলো খেটে মরে, তোমরা মজা লোটো। আর সাংবাদিক হিসেবে? সব কাগজেরই চোখের মণি দু-একজন নায়কমার্কা সাংবাদিক থাকে। আমরা সবাই ফেকলু। টাকা পয়সা?

সবার হয় না।

তবে জাগুলা যাব? বলছ?

যাও না।

এম এল এ কে?

আপিসে এসো। বলে দেব।

ওই 'বসাই টুডু' ব্যাপারটা জানলে কি করে?

জানতে চেও না। জানা যায়।

এর পরেই দ্বৈপায়ন সরকার আসে জাগুলা। সামন্তের কথায় রামেশ্বর ভূঞা ওকে জাগুলার 'ভূঞা ভবন' খুলে দেয়। 'ভূঞা ভবন' বিষয়ে রামেশ্বর বলে, বাড়ি আপনার। যতদিন মন চায় থাকুন কেনি? তবে ফটোক লড়াবেন নাই।

গান্ধী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জওহরলাল, ইন্দিরা গান্ধী, সকলের ছবির পাশে একটি টেকো ও বলিষ্ঠ চেহারার হাসিমুখ মানুষের ছবি।

রামেশ্বর বলে, হঁ! আমাদের অতুল লেলিনের ফটোকটি বানাইচেঁ। লিয়ে লিলম একটো। ইয়ারা গদী ছাড়লে লামায়ে লিব। বুঝচেন কিছু? থাকবে না যাবে?

যাবে কেন?

বলেন, তাই বলেন। সামন্ত আমাদের লিডার কি। কি বক্তিতা দেয় শুননেনাই কখুনো আপনি। আমরাও আছি ভালো। হঁ, এই না হলে লিডার? ই কি কালী সাঁতরা, যি ছিঁড়া চটি আর মোটা ধুতি পরে চাষীঘরে ঘুরে বুলবে? আমার লোক আপনার পাকসাক করে দিবে। চাল-ডাল-চিনি-তেল-চা সব আছে। রামেশ্বররে রাখতে হয়। কাঁচা বাজারটুক করবেন আজ্ঞা।

আপনি কোথায় থাকেন ?

কাঁকড়াসোল। ভূঞা রাজাদের বংশ বটে মোরা। দেশঘরেই থাকি ভালো! জাগুলায় মন উঠে না। বাস সার্ভিস; জীপের গেরেজ তা কর্মচারী দেখে। যেয়েন একদিন।

রামেশ্বর চলে যায়। সেই থেকে দ্বৈপায়ন এখানে। 'জিলাবার্তা' কাগজের পুরনো ফাইল ঘেঁটে সাঁওতালদের অতীত কাহিনী উদ্ধারের সময়েই তাকে দেখেছিল মাতো ডোম।

সামন্ত তাকে বলে, ইন্দ্র প্রামাণিক আপনাকে নিয়ে যাবে চরসা।

হ্যাঁ, চরসা নিয়ে তখন অনেক হাঙ্গামা হয়।

কেন ?

'কেন' মানে ?

দ্বৈপায়ন ঈষৎ তাচ্ছিল্যভরা হাসি ঠোঁটে আঁটে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা, তার মতে, অত্যন্ত বর্বর। অশিক্ষিত। তারপর কেটে কেটে বলে, এক রকম আর্থিক অবস্থা ও জনবিন্যাস বিশিষ্ট পাঁচটা গ্রামের মধ্যে চারটে গ্রামে কিছুই হল না, একটা গ্রামে হল। কেন হল ? কেন হয় ?

অ!—সামন্ত গভীর বিতৃষ্ণায় বিপক্ষীয় কম্যুনিস্ট দলের এই বুদ্ধিজীবীর দিকে তাকায় এবং মনে মনে ভাবে, শালার যত্তো আঁতেল ওদের ক্যাম্পে, যত্তো ওয়ার্কার আমাদের। সেইজন্যেই এ-সব আকাট ছাগলকে সহ্য করতে হচ্ছে। তারপর শুকনো গলায় বলে। গ্রামের গণ্ডগোল কেন হয় তা জানেন না ? গ্রামের ওপর লিখছেন? জমি নিয়ে, জমির দখল চেয়ে গোল পাকায়, জানেন না ?

সে তো সবাই জানে।

তা হলে কি জানতে চান ?

লড়াকু গ্রাম যখন লড়াই করে না তখন নিশ্চয় চুরি, বাটপাড়ি,

ছিনতাই এ সব করে ?

না মশায়। ও সব কাজে ভদ্দরলোকেরা আমরা কম যাই না। ওগুলো তো অপরাধ। জমির জন্যে লড়াইও কি তাই ?

যাকগে, ওখানে অবস্থা কি ?

সামন্ত একটি ম্যাপ দেখায় ওকে। মোটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, এগুলো হল তখনকার লড়াকু গ্রাম।

এতগুলো ?

হ্যাঁ। এবারকার চার বছরের মধ্যে আমরা অঞ্চলটাকে ভেঙে ভেঙে একাধিক থানার আওতায় এনেছি। হাইওয়ে তৈরি হচ্ছে। হাইওয়ে যখন অঞ্চলটার মধ্যে দিয়ে চলে যাবে বহু জঙ্গল কাটা পড়বে। এখানে বাঁধ পড়বে। এই খালগুলো কাটা হবে। চরসা নদীর উদ্দামতা কমবে।

এতে অঞ্চল উন্নয়ন হবে ?

হবে। আর জায়গাটার বিচ্ছিন্নতা তো থাকবে না। এই বিচ্ছিন্নতা কিন্তু সশস্ত্র আন্দোলনের সহায়ক।

একটা কারণ ?

আমার মতে তাই। প্রধান কারণ।

জমির ব্যাপার যে-কে-সেই রেখে বিচ্ছিন্ন একটা জায়গাকে শহরাঞ্চলের সঙ্গে জুড়ে দিলে সমস্যার সমাধান হয় না। যে কোনো ভালো বই পড়ুন, সবাই তাই বলবে।

সব সমস্যার সমাধান কখনো হয় কি ?

এ-সব জায়গায় যাচ্ছি কি করে ?

আপনি যাচ্ছেন এইসব জায়গায়, দেখা করছেন এইসব লোকের সঙ্গে। এরা সাঁওতাল। না, চরসা-পলতাকুড়ি-কদমখুঞা-পিয়াসোল-বাকুলি যাচ্ছেন না। ঠিক এই গ্রামগুলোয় যাচ্ছেন, এই লোক-গুলোর সঙ্গে দেখা করছেন। ইন্দ্রকে সব বলে দিচ্ছি আমি।

যা বলেন।

ইন্দ্র সোনার টুকরো ছেলে। লড়াকু। —বলে সামন্তের মনে হয় যথেষ্ট বলা হল না। তাই 'সোনার টুকরো ছেলে' শব্দ-নিচয়ের ব্যাখ্যা হিসেবে বলে ওর ডান হাতের গুলিটা দেখবেন। দেখার জিনিস। এমন জিনিস দেখেননি।

কেন? গুলি দেখব কেন?

কোনো জায়গায় পালটা ইন্‌ডাসট্রিয়াল ইউনিয়নের সঙ্গে লড়াইয়ে ওরা পটাপট ছররা ছুঁড়ছে। ইন্দ্র স্রেফ টিপে টিপে ছররা বের করছে গুলি থেকে। দাগ আছে।

ও বাবা!

ভয়ের কি আছে? চেহারা দেখে ঘাবড়াবেন না যেন। ইন্দ্রের চেহারাটা জাঁকালো।

গ্রামকর্মী?

সামন্তের চোখ দিয়ে অস্বস্তির মেঘ ভেসে যায়। শুকনো হয়ে যায় গলা, হ্যাঁ।

ইউনিয়ন কর্মী ছিল?

গ্রামে চলে এসেছে।

কবে আসবে?

খবর দিয়েছি। আসবে।

মনে মনে ইন্দ্রকে গাল পাড়ে সামন্ত। খবরটা সে কয়েকদিন হল দিয়েছে ইন্দ্রকে। 'যাচ্ছি' বলে ইন্দ্র প্রামাণিক বেপাত্তা হয়ে গেছে চারদিন হল! সামন্ত ঠিক করে এবার সে কলকাতা ফিরবে বটে, কিন্তু ইন্দ্রর কাছে জানতে হবে, মাঝে মাঝেই সে উধাও হচ্ছে কোথায়। এবার নিয়ে চারবার হল। সাঁওতাল বিদ্রোহের একশো পঁচিশ বছর উপলক্ষে সরকারি উৎসবের তোড়জোড়ে ইন্দ্র একেবারে মাথা দেয় নি।

চিন্তার বিষয়। কালী সাঁতরার ব্যাপারে পুলিশের হঠকারিতার কারণে সামন্তের জাগুলা সাম্রাজ্যে এত বিপর্যয়। 'অপারেশন

বসাই টুডুতে' গিয়ে কালীকে মারলি কেন? কালীই বা সেখানে গিয়েছিল কেন? কালীর ব্যাপারে সারা শহরে ও গ্রামে কেউ সরকারি নীরবতা, নিরুদ্দিষ্ট কালীর খবর, ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে নি কেন? গভীর, গভীর অস্বস্তি।

ইন্দ্র প্রামাণিকের বয়েস এখন বছর ত্রিশ। দেখলে বেশি মনে হতে পারে, কমও। অসম্ভব লম্বা-চওড়া, পেশল ও বলিষ্ঠ চেহারা। রঙ বেশ কালো। বেশ অল্প বয়সেই ও পার্টিতে আসে সাইকেল রিকশা ইউনিয়ন থেকে। রাজনীতিক পড়াশোনায় ওর হাতে-খড়ি কালী সাঁতরার কাছে। সাহসী ও সাচ্চা ছেলে হিসেবে ওর পরিচিতি ছিল। সামন্ত ওকে নিয়ে যায় হাওড়া। শিবরাম পেপার মিলে রাজ্জাকের সহকারি হিসেবে শ্রমিক ইউনিয়নের কাজ করার জন্যে। কাজটি সোজা ছিল না। মালিকের মদতপুষ্ট পালটা ইউনিয়ন শ্রমিক নিয়োগে ঠিকাদারি প্রথা চালু করে পুরনো ইউনিয়নকে ভেঙে দিতে চেষ্টা করছিল।

ইন্দ্রর অক্লান্ত চেষ্টা এবং পরিশ্রমে সংঘর্ষের পর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তাদের ইউনিয়ন জয়ী হয়। অবশেষে, পঁচাত্তরে ইন্দ্রকে নিকেশ করার সিদ্ধান্ত হয়। নিযুক্ত গুণ্ডাদের সঙ্গে পাইপগান যুদ্ধে ইন্দ্র সত্যিই হাতের পেশী থেকে টিপে ছর্‌রা বের করে এবং এগোতে থাকে। দৃশ্যটি ভয় জাগানো। ইন্দ্রকে অরণ্যদেবই মনে হয় প্রতিপক্ষের। রণে ভঙ্গ দেয় তারা। তাদের জখম করার কারণে ইন্দ্র গ্রেপ্তার হয় পরেপরেই।

সাতাত্তরে জেল থেকে বেরিয়েও সে হাওড়া ও কলকাতা শহরেই ছিল। কিন্তু ইউনিয়নের তখনকার কর্তাদের সঙ্গে মালিকপক্ষের সম্পর্কে উন্নতি দেখে ইন্দ্র ঘাবড়ে যায়। কিছুদিন ঘুরেফিরে আবহাওয়ার আঁচ পেতে চেষ্টা করে। তারপর দেখে, চাইলে সে ভালো বাড়িতে থাকতে পারে, ভালো ভাবে। লেবার ইউনিয়নের

কর্মকর্তার অবস্থা এখন রীতিমতো ভালো। রজ্জাককে ও বলে, লেবারের সঙ্গে আমি আর এক শ্রেণীতে থাকছি না তা হলে ?

রজ্জাক এ কথার উত্তরে তাকে নানারকম বোঝায়। ইন্দ্র আরো খেপে যায় যখন দেখে ঠিকাদারি প্রথাও মেনে নেওয়া হয়েছে অংশত। সেদিন যারা তাকে মারতে গুণ্ডা লেলিয়েছিল, তারাও করছে কামারাদোরি।

লেবার ইউনিয়নের হামিদ বিষণ্ণ চিত্তে বলে, ফিলিম পালটে গেছে গুরু। ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিল সবাই। সব ফরণ্টে এহি বন্দোবস্ত এসে যাচ্ছে। এ কি হল ?

ইন্দ্র পার্টি পর্যায়ে এ প্রশ্ন তোলে। সদুত্তর পায় না। বিভিন্ন পর্যায়ে সাচ্চা ক্যাডারদের মধ্যে দেখে নেতাদের আপশপন্থী কার্য-নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ। ভীষণ ধাক্কা খায় ও। ওর মনে হয়, কলকাতায় সবকিছুর কেন্দ্র, প্রলোভন বেশি, তাতেই কি সব এ রকম মনে হচ্ছে ?

পার্টির প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা থাকে তার, তবু সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, প্রশাসনিক কাঠামোতে কিছুই বদলায় নি। ঘুষ চলছে অবাধে। দ্রব্যমূল্য রোধ, বিদ্যুৎসংকট সমাধান কোনো দিকে কোনো চেষ্টা নেই। আছে শুধু কথা, কথা, কথা। ইন্দ্র ঠিক করে ও সামন্তকে বলে, আমি গ্রামে কাজ করব।

সামন্ত বলে, ভালো, খুব ভালো।

জাগুলার খবরবার্তা নিতে গিয়ে ইন্দ্র, সামন্তের মুখে বসাই এবং কালীর কথা শোনে। 'কালী নিরুদ্দেশ' কথাটি তখন ওর মাথায় তেমন দাগ কাটে না। দীর্ঘ দিন বিচ্ছিন্ন ও জাগুলা থেকে। মাঝে-মধ্যে যেত শুধু।

সামন্ত বলে, চরসা গ্রামটাকে কেন্দ্র কর। বহু অপ্রীতিকর ঘটনার জায়গা। এখন একটা সুস্থ রাজনীতিবোধ সেখানে গড়ে তোলা দরকার।

যাব।

কঠিন কাজ, ইন্দ্র।

শহরের পর গ্রাম?

হ্যাঁ।

শহরে তো একটা পর্যায়ে সব কেনাবেচা হয়ে গেছে দেখছি।

ওগুলো প্রচার, অপপ্রচার।

না। সব অপপ্রচার নয়। অল্প দেখেই বুঝলাম।

সব বুঝে ফেলেছ?

আমি পার্টির কাজ করতে এসেছি সামন্তদা, কাজ করব। হাওড়ায় লেবার অঞ্চলে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল না, হল। আমি তো গ্রামের ছেলেই ছিলাম একদিন। কাঁকড়াসোল গ্রামে আমাদের বাড়ি ছিল। ললিত প্রামাণিক, তোমার বাবা জাগুলা এসেছিল সেও তো বহুকাল আগে। তার দোকানের কথাও আমার মনে আছে।

আমার মনে নেই। দেশে জমিজমা শিবেশ্বর ভূঞা নিয়ে নেয়, আমি শুধু ঘর দেখেছি। জাগুলা এসে বাবার সেলুন খোলা আমার মনে পড়ে না। বাবা মরে যেতে আমরা কাঁকড়াসোল ফিরে যাই। ঘরে কাকা থাকত। আমরাও ছিলাম। তারপর আবার জাগুলা।

শিবেশ্বর ভূঞা ওরকমই ছিল।

রামেশ্বর তো বাপের চেয়ে অনেক বজ্জাত।

ছিল একসময়ে।

এখন আর নেই?

সামন্ত একটু চুপ করে থেকে হেসে বলে, না না। সেও বুঝেছে আমাদের তোয়াজ করে চলতে হবে।

তাই? না মস্ত জোতদার রামেশ্বরকে আমরাই তোয়াজ করে চলছি সামন্তদা? আপনি চটে উঠবেন না। যাবার আগে আমি কিছু কিছু কথা পরিষ্কার জানতে চাই।

তুমি অপারেশন বর্গার বিষয়ে জান না।

কে বলল ? পড়ে যা জানা যায়, সব জেনে নিয়েছি। রামেশ্বরের জমি তো আছেল। সে জমি সরকারের খাস হয়েছে ? বর্গা রেকর্ড হয়েছে ? অপারেশন বর্গায় ?

হবে হবে নিশ্চয়।

ইন্দ্র বুঝেছিল হবে না। বুঝেছিল গ্রাম পর্যায়েও একই নীতি সরকারের। তার মনে আসে বিভ্রান্তি।

আমি চরসা যাব। চরসা কত বড় গ্রাম ? কে কে বেশি জমি রেখেছে বেনামে ? কেউ রাখে নি ? জমিজমা বাকুলির সূর্য সাউদের ? সূর্য সাউ নিহত, তাই না ? তার ভাই রোতোনি সাউ মালিক ? গরিব গ্রাম ? শতকরা চারজন বর্গা করে, বাকি সব খেতমজুর ? সেখানে যাচ্ছি কেন ?

খেতমজুর ফ্রন্ট গড়তে ইন্দ্র, আর দিলীপ সোরেনকে হটাতে। দিলীপ সোরেনের প্রভাবটা ভালো নয়।

কি করেছে ?

কিছু করছে না, এই হল সমস্যা। শিক্ষিত ছেলে, মাধ্যমিক পাস। পুলিশে চাকরি হয়ে যেত ওর। চরসায় একসময়ে প্রচুর হাঙ্গামা হয়েছে। ও যোগ দিয়েছে বেতুলের ছেলে উদ্ধবের সঙ্গে। ভালো ব্যবহার করার এই তো পরিণাম।

উদ্ধব একসময়ে বসাই টুডুর দলে ছিল। ও গা-ঢাকা দিয়েই ছিল। বেতুল মারা যেতে ও এতকাল পরে ফিরল। তারাচাঁদ ভূঞা ওদের তুলে দিল সদর গ্রাম থেকে। উদ্ধব চোটপাট করে সকলকে নিয়ে চরসায় তুলেছে। ওকে তো ধরলাম না, কোনো কেসে জড়ালাম না।

বেতুল কে ? উদ্ধব কে ?

সব বিরোধী শক্তি।

তারপর ?

দিলীপ আর উদ্ধব আবার কি সব ফেঁদে বসতে পারে।. ধান-কাটা, খেতমজুরি, হাজারটা ঝামেলা তো আছে।

চরসায় থাকলাম, খেতমজুর দল গড়লাম। ভালো। মজুরি দেবার সময়ে কার পক্ষ নেব?

খেতমজুরের নিশ্চয়।

জেনে নিচ্ছি। আমার জানা পার্টি লাইন এখন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে তো।

তবে হাঙ্গামা কোরো না। মালিক যদি খুব জেদ ধরে কম দেব বলে···

শায়েস্তা করব।

না না, হাঙ্গামা নয়। তখন বলেকয়ে একটা আপশ রফা করতে হবে। নকশালদের মতো উগ্রতা কোরো না।

ন্যায্য মজুরি 'আন্দোলন করে আদায় করে দেব' বললে নকশাল হয়ে গেলাম?

আহা, রাগ কর কেন?

আমি যাই চলে।

তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

ক্যাডারের খবর এত ভুলে যান কেন? মা নেই, এক ভাই আছে, সে চিত্তরঞ্জনে কাজ করে।

রাজনীতি করে?

না। সংসার করে।

বাড়িটাকে রাজনীতিক করতে হয়।

কি যে বলেন! আপনার বাড়ির বাইরের ঘরে কথা বলছি। ভেতরে সাঁইবাবার গান হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। বকান কেন?

এটা কি রাজনীতিকের বাড়ি?

যে যার পথে চলে ইন্দ্র···তুমি এসো।

তারপর, যেন কোনো দরকারি কথা ভুলে গিয়েছিল এ-ভাবে

ইন্দ্রকে ডেকে দাঁড় করিয়ে সামন্ত বলে, কলকাতায় নকশাল হাঙ্গামার সময়ে তুমি তো এখানেই।

হ্যাঁ।

তোমার ওখানে গোলমাল হয় নি ?

না।

কি একটা শুনছিলাম, হ্যাঁ, মমিরুল কে ?

ইন্দ্রর মুখ খুব ভাবলেশহীন হয়ে যায়, বেঁটে ও রোমশ ভুরু কুঁচকে যায়, কেন বলুন তো ?

সে তো নকশাল, তুমি তাকে…

আমাদের হানিফের ভাই। ইলেকট্রিক সাপ্লাই ইউনিয়নে ছিল। নকশাল। তাড়া খেয়ে লেবার বস্তিতে আশ্রয় নেয়। আমি একা নই, আমরা সবাই সে সময়ে ওদের ইউনিয়নেব কিছু ছেলেকে আশ্রয় দিই, বাঁচাই।

কেন ? মানে, তোমাদের ও রকম করার কারণ কি ? ওরা আমাদের হাজারে হাজারে মারছিল—

তাই কি ?

তার মানে ?—সামন্ত মনে মনে সতর্ক হয়।

ওরা মেরেছে, আমরা মেরেছি। পুলিশ মেরেছে। কারো হাত সাদা ছিল না তখন. ছিল কি ? আমাদের ও রকম করার কারণ, ওরাও লেবার, তাড়া খাচ্ছিল পুলিশের। লেবার হয়ে লেবারকে মারলে বা পুলিশের হাতে তুলে দিলে আর মারত না কেউ। আমাদের ওখানে পার্টিতে পার্টিতে লেবার পর্যায়ে টেনশন ছিল না। পুলিশ বনাম লেবার দাঁড়িয়েছিল ব্যাপারটা—

লেবার এ ক্ষেত্রে নকশাল—

নিশ্চয়। এ-ভাবে সাত-আটজনকে আশ্রয় দিই। আঞ্চলিক নন্‌লেবার পার্টির ছেলেরা হামলা করলেও মারতে দিই নি। ফলটা ভালো হয়েছে মনে করি। ন বছরে আমরা আটজন সাচ্চা

কমরেড পেয়েছি। তারা আমাদের সাথে আছে এখন।

ভালো, খুব ভালো।

কি যাচিয়ে দেখলেন, আমি নকশাল কি না ?

না। তুমিই পারবে।

কি ?

গ্রামে সুস্থ রাজনীতিক আবহাওয়া আনতে।

সেই বিশ্বাসেই ইন্দ্র চরসায় আসে। দিলীপ সোরেন ও উদ্ধব কাওরা বিষয়ে তাকে বারবার সাবধান করে দেয় নবীনবাবু ও মতিবাবু, দুই প্রবীণ কর্মী। চরসা বিষয়ে বিশদ খবর জানতে চায় ইন্দ্র।

কেন ? জেনে কি হবে ?

ইন্দ্র অতীব সংশয়ে দুই প্রবীণ কমরেডের চিকচিকে চেহারা, হাতের দামি ঘড়ি ও ভালো পোশাক দেখে। সর্বত্র বেনোজল না কি ? বলে, দরকার আছে।

কি দরকার ? তুমি বাইরের ছেলে, আঞ্চলিক ব্যাপার-স্যাপার বুঝবে না। কি থেকে কি হবে।

ইন্দ্রর হঠাৎ যুক্তিহীন রাগ হয়। বলে বাইরের ছেলে নই। ললিত নাপিত আমার বাবা ছিল। জাগুলায় টিনের দোকান ছিল, সেলুন ঘর। বাবা মরে যেতে মা কিছুদিন এ শহরে মুড়ি ভেজে দোকানে দোকানে দিত। 'কি থেকে কি হবে' মানে কি ?

তোমার কথাবার্তাও খুব রুক্ষ হে।

যান যান। আমরা বছরের পর বছর রুটি আর পেঁয়াজ খেয়ে লেবার ইউনিয়ন গড়েছি। এখন বাপজ্যাঠার মতো শ্রদ্ধাসম্মান চাইছেন। পার্টির প্রবীণ লোক হয়ে খোচর-দালালের মতো মাগ্গা মেরে দামি সিগারেট ফুঁকছেন, লজ্জা করে না ? পার্টি ভাঙিয়ে চলছে খুব তাই না ?

আরে, আরে…

এর প্রত্যেকটির জবাব দিতে হবে আমাদের কাছে। এসেছি যখন, বেরুব না তল্লাট ছেড়ে। এত বছরের পার্টি ইমেজকে ক বছরে আপনাদের মতো লোকরা মাটিতে ফেলে দিচ্ছেন। কিষাণ ফ্রণ্টের প্রবীণ কর্মী! জেলা সমিতির সেক্রেটারি! এটুকু জ্ঞান নেই যে যে-গ্রামে নকশাল আন্দোলন হয়েছিল, যে গ্রামে আমি যাচ্ছি সে গ্রামের পরিষ্কার পিকচারটা পাওয়া আমার দরকার। আপনারা যা জানেন তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

নবীনবাবু ও মতিবাবু পরস্পরের দিকে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেলে। বলে, দীনু সব বলবে।

দীনু কে?

দীনু কাওরা, আমাদের ক্যাডার।

চরসায় থাকে?

না। চরসায় আমরা ঠিক সুবিধে করতে পারি নি। তাতেই উদ্ধব আর সোরেন খুঁটি গেড়ে বসেছে।

দীনু কাওরা!

হ্যাঁ, উদ্ধবের জ্ঞাতভাইও হয়। উদ্ধবের মতো নয়। ক্লাস নাইন অবধি পড়েছে।

দীনুকে দেখেই ইন্দ্র বুঝেছিল, এ সাচ্চা ছেলে। শান্ত, কম কথা বলে। ইন্দ্রকে ও বলল, কালী বাবুর 'জিলাবার্তা' কাগজের ফাইল পড়ে নেন সমিতি আপিসে বসে? কালীবাবু ঘুরে ঘুরে সকল সংবাদ আনত। সব পাবেন সেথা। গাঁ-গেরামের একোটা ধরত, সকল বিত্তান্ত লিখত। ইনারা তো তাই পড়ে আর বলে।

কালী সাঁতরা।

হ্যাঁ। বড় মান্যের মানুষ ছিল। কোনো ধান্দাজালী জানে নাই। সি মানুষ জাগুলা জানত আর গাঁ-গেরাম জানত। কলকাতা কেনি, কোনো শহরে যেত নাই। তা সি মানুষ—! চলেন, লয়ে যাই।

কালী বাবুর কি হল ?

চমকে উঠল দীনু। ভয়ে। বলল, জানি না। থানাতে ছবিটো আছে। বলে খোঁজ মিলে না।

'জিলাবার্তা' কাগজটির ছাপা অস্পষ্ট, হরফ ভাঙা। খবরের দিক থেকে প্রচুর খবর। একজন লোক, প্রবীণ পার্টি কর্মী, একক চেষ্টায়, যত্নে ও পরিশ্রমে কাগজটি চালাত। ইন্দ্র দেখে অবাক হল, ষোল বছর ধরে নিয়মিত বেরিয়েছে কাগজ। নবীন বাবুও বলল, অসামান্য লোক ছিল কালী। একদিনের জন্যে আদর্শচ্যুত হয় নি।

ইন্দ্র লক্ষ্য করল, দীনুর প্রতি নবীনবাবুর ব্যবহার—বেয়ারার প্রতি ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যবহারের মতো। লক্ষ্য করল, দীনু এবং নবীন বাবু, কালী সাঁতরা বিষয়ে 'ছিল' শব্দটি ব্যবহার করল। এ রকম তখনি হয়, যখন মনে মনে স্থির জানা যায়, যার বিষয়ে কথা হচ্ছে সে মৃত।

দীনুর সঙ্গে মেলাতলায় দীনুর সাইকেল-রিকশা চালক মেসোর ঘরে দু-দিন থেকে যায় ইন্দ্র। মেসো ঘরটি ছেড়ে দিয়ে বারান্দায় শোয়। মাসি গেছে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। দীনু এখানে অনেক সহজ ও স্বচ্ছন্দ। ইন্দ্রকে নবীন বাবুরা কি কি বলেছে, সব সে শোনে মন দিয়ে।

তারপর প্রশ্নসমাকুল চোখে বলে, আমি বুঝি না একটো কথা। আপোনি বুঝাবেন ?

কি ?

দীনুর মেসো বারান্দার ঘেরা কোণে ওদের জন্যে রাঁধছে। সে ডালে ফোড়ন দেয়। লঙ্কার ঝাঁঝ। তারপর আলুচচ্চড়ি বসায়। রান্নার পদ্ধতিটা ইন্দ্র জানে। মা করত। আলু, পেঁয়াজ, লবণ, হলুদ সব জলে সিদ্ধ করে নিয়ে একপলা তেলে লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে ভেজে নেওয়া। দীনুর মেসো রান্না চাপিয়ে চাপা গলায় অতীব

বিস্ময়ে কালীকীর্তন গান। দীনুর প্রতি ব্যবহারে ওর সমীহ খুব। শিক্ষিত ছেলে, পার্টির ছেলে দীনু।

ইন্দ্র যখন বলে, কি ?

দীনুর মেসো ডেকে বলে, সি কালী বাবুর কথা, বেতুলটোর কথা ? এত বুঝ, উ কথাটো বুঝতে লারছ কেনি বাপ ? মারি দিছে দু জনারে, চকবাজারে সভে জানে।

দীনু হেঁকে বলে, তা বলি নাই।

ইন্দ্র বলে, কি ব্যাপার বল তো ?

মেসো ঘরে আসে ও বলে, উ বলতে লারবে বাবু, আমু বলি। কালী বাবুরে মারছে পুলুশ—আর তার তো গতিগঙ্গা হয় নাই, জঙ্গল হতে তার হাড় লয়ে চাদরে বেন্ধে আনছিল বেতুল—দীনুর জ্যেঠা—তারে ভি মারছে। বলে, বেতুলটো নাকি থানা যেয়ে হামলা উঠছিল। ই সব মিছাধান্দা কথা—সভে জানে। তা কালী বাবু নাই বলে স্বীকার যেছে নাই, ফটোক্‌টা থানায় রাখছে। বেতুলের লাশ আমাদের দিছিল, মিছা বলব নাই। আমরা ভি চান্দা উঠায়ে খুব যত্ন করি জ্বালালম, হাঁ! আর ছরাদ ভি করালাম বড় ছেলারে দিয়া। উদ্ধবটো ঘরে আস্ত অ্যানেক দিন বাদে। আশ্চাজ্জ! লক্‌শালীটো উদ্ধব, মারি দিবে তারে, কথো শুনতম। কিছু বলে নাই! সি ভি গুম্‌ হয়্যে বসি থাকি থাকি একদিন সবারে লয়ে উঠাল চরসায়। আর আসে না।

সেখানে কোথায় গেল ?

সান্‌থাল সামাজে ঘর বাঁধি নিছে।

চরসার কথাই দীনুকে শুধোচ্ছিলাম।

উ কি জানবে ? রতন ডম আসবে, রতন বলবে।

রতন ডোম ?

দীনু যা বলল, তার মানে হচ্ছে, রতন ডোম চরসার বাসিন্দা। অত্যন্ত মিলিটারি মেজাজের লোক। বছরে কয়েক মাস খেতমজুর।

অন্য সময়ে বাঁশের ডালা-কুলো-চুপড়ি বোনা ভরসা। আর ভরসা চরসা জঙ্গলের মূল, কন্দ আহরণ, শজারু, খরগোশ, গোসাপ শিকার করে খাওয়া। রতনের ছেলে মাতো এ শহরে রিকশা চালায়। সে সময়ে নগদ টাকা, রঙিন গেঞ্জি, শস্তার ছোট্ট ট্রানজিস্টার, ইত্যাদির বিনিময়ে পুলিশের খোচরগিরি করে মাতো। না করলে বেদম প্রহার। থানার মিসির শহরের রিকশাচালক, দোকানী, গ্রাম থেকে সওদা-আনা মেয়েপুরুষ, সকলকে দিয়ে খোচরগিরি করাত। মাতোকে বেদম মারে রতন এবং গ্রাম থেকে বের করে দেয়। মাতো খোচর কাজ বহুকাল ছেড়েছে! এখন রতন ছেলের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে কথা বলে। তবে জাগুলা এলে এখানেই ওঠে। দীনুর মেসো, রতন, বেতুল, সবাই এক সময়ে কালীর কীর্তন গাইত। মধু ডোম সেই দল গড়েছিল।

রতন চরসাতেই থাকে?

হাঁ হাঁ। আর কোথা?

তুমি কি বুঝতে পারছ না?

চরসাতে এক সময়ে নকশালী খুব হয়। তা বাদে বসাই টুডু—নাম শুনে থাকবেন আপোনি, তিনি যখন পার্টি ছাড়ি; অ্যানেক গাঁ-গেরাম জুড়ি সান্‌থাল খেতমজুর লয়ে লড়াই চালাল, তখুন চরসার সভে মদত দিছে। সি কারণে পুলুশ মেলেটারি চরসায় খুব জুলুম করে, আর এখুনো চরসার হাল একোই রকম। জুলুমের শেষ নাই, খরায়-বানে রিলিফ নাই, কুনো সুসারের বেবস্থা নাই। কেনি? সকল দিকে বহুত দুঃখ ছিল বলি নকশালী উঠাছিল তারা। রতন ডম এক লিডার ছিল। এখুর্ন দুখের আমানি আমরা কেনি করি না? মনে কথাটো উঠে।

নবীনবাবুরা কি বলে?

বড় লিডার মোরাদের কথা শুনে না। বেশি শুধালে বলে, নকশালী নাকি তুই দীনু? কিন্তুক—

কি ?

নকশালী হচ্ছিল কেনি? হেথা ছিল না বাহারের বাবু নকশাল। বীর পাঠক ভি মহল্লার ছেলা, সি মরি গিছে কভে। বসাই যি আন্দোলন উঠাল, তা তো কারণ লয়ে? সি সকল দুখ এখুন ভি আছে। আর যি কথা নবীনবাবুরা মানে না, ই সকল গাঁ-গেরামে সান্থাল-ডম-কাওরা সভে কত জুলুম সহিছে পুলুশ-মেলেটারির—তব ভি বলে, সি নকশালীরা ছিল, আমা'দর দুখ বুঝিছে—বসাই বুঝিছে। ইন্দ্রদা, আমরা সাচাই কর্মী—জান দিয়া কাম করি। তব ভি উয়ারদের মনের মানুষ হতে দিছে না।

কেন ?

দীনু হতাশায় দীর্ণ কণ্ঠে বলে, অপারেশন বর্গার কথায় জান আর মান কবুল করি কার কত বেনাম জমি, লিস বাখাল গৌর, কদম আর রজত। কানুনগো অফিসারটো ভি সাচাই ছিল। লিস হতে নবীনবাবু, রামেশ্বর ভূঞা আর রোতোনি সাউর নাম মুলতবি তালিকায় সরায়ে রাখি দিছে কেনি? হঁা, তারা পার্টি ফাণ্ডে টাকা দিছে—কিন্তুক তারাদের লোক পঞ্চায়েত প্রধান হয় কেনি? সিথা নকশালী হছে, সিথা সাচাই ক্যাডার যাবে, তারে যতখন শুধাবে, হাজার বিঘা বেনাম জমির মালিকের জমিন ভেস হয় না সরকারে, একশৎ বিঘার মালিকের জমিনে, পঞ্চাশ বিঘা জমিনের মালিকের বেলা বেনাম জমি খাস হয় কেনি? ক্যাডারটো আমি, পার্টি আমার জাহান, আমি কি জবাব দিব ?

আর কি ?

মজুরি দিবে না রোতোনি, রামেশ্বর, তারাচাঁদ, জিলাটো যাদের—তখুন বলথে হবে, ভাই সব! সরকারি খেতমজুরি লয়ে লড়াই উঠাও কেনি? যা দিছে তা মানি লও। আর জাগুলায় মুদি দোকান করে হরি পাড়ুই! তার দশ বিঘা জমির জন্য খেতমজুর নির্ভর। হরিরে বলথে হবে, ইটো হকের মজুরি।

মজুরি নাই তো ধান রুয়া নাই, নিড়ান নাই, কাটা নাই। কেনি? কত বলব? মতিবাবুর ভি বেনাম জমি বিস্তর।

মতিবাবুর? কোথায়?

সদরে। সে জমিনটো ভেস করালে পার্টির মাথা উঁচা হত। সে কি করছে জানি না। শুনলাম, তার জমিনে বর্গা নাই। ভেস হবে না, বর্গা রেকড হবে না। কেনি?

আর কি দীনু, আর কি?

তবে বুঝ, কেনি মোরাদের সাচাই ক্যাডাররে ভি বিশ্বাস যায় না কেউ? কোনো জোতদার-মহাজনরে চাপ দিতে মানা কেনি? শুধা শুনি, কোনো হাঙ্গামা না হয় যেমুন। গ্রামে চল, দেখ নিজ চক্ষে। কারা পঞ্চায়েতে মাথা হছে দেখ! দেখ মজা নিজ চক্ষে। বানটো হছে, ফুড ফর ওয়ার্ক স্নুনছ, কে নিতেছে সি গম?

আরো আছে দীনু?

হঁা, করতে দিত কাম—দেখায়ে দিতাম আমরাও পারি খেতমজুরির লড়াই করতে, আর খেতমজুরের মদত ভি পেতাম। বেনাম জমি খাস করি জোতদাররে জব্দ করতাম, দেখায়ে দিতাম হঁা, আমরাও লড়াই জানি। কিন্তুক কিছু করবার উপায় নাই। শুধা মিছা কথা বলি মানুষরে, দুখীভুখা মানুষরে ভুলানো যায়?

কেন, কেন কাজ করতে দেবে না?

করিবারে যাও যদি, তবে তুমি নকশাল।

সে কি কথা?

এই কথা। এই দুখে জ্বলি জ্বলি মোরা মরি আছি। নয়তো রোতোনি সাউরে লয়ে—

কি হল?

অপারেশন বর্গার কার্যসূচীর একটি প্রতীকী ঘটনা বলতে যায় দীনু, কিন্তু তার আগেই, সদানন্দ কুথাক? ডিংলাটো ধর কেনি? শালো ভারি কি?—বলে হাজির হয় এক বেঁটেসেঁটে বুড়ো।

কপাল, ঘাড় ও ওপর হাতের ক্ষতের দাগে আভিজাত্য আছে। যেন কেউ দা দিয়ে কুপিয়েছে।

লোকটি জানে, তার ক্ষতচিহ্ন আগে দেখে মানুষ, তারপর নাম জানতে চায়। এ রকম নিশ্চয় বহুবার হয়েছে। তাই সে বলে, দা তুলি কুপাইছিল। রতন ডম আমি। তুমু সি বাবুছেলা, চন্নসা যেয়্যে কিষক সভার কামটো করিবার চাহ। যেয়্যে লাভ নাই। ডিংলাটো ধর কেনি দীনু ?

লাভ নেই কেন ?

বড় চাষী বলতে নাই, লেংটা মজুরের গেরাম। এমোন গেরামে কিষক সভার কমরেট যাবে ?

তোমাদের কে কি বুঝিয়েছে জানি না। এমন গ্রামেই তো কৃষকসভা কাজ করে।

রতন ডোম বসে থেবড়ে, গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খায় ও তিক্ত হেসে বলে, করে না, করত। হাঁ, নকশালরে মদত দিছি, হাঁ, বসাইরে মান্য দিছি। কিন্তুক বাঁচিবার লাগি ইবারে সামন্তবাবু যখুন কালীবাবুরে লয়ে যেয়ে দাঁড়াল—হাঁ, রতন ডম কথা দিছে ভোট আনি দিবে আর দিছেও ভোট আনি। কেনি দিছে ? সূর্য সাউর গমস্তার মাথাটো লামায়ে দিছিল রতন ডম, সবে জানে। সাউর গুণ্ডাদের হাতে দা, শুধা কোপায়। তবও মাথাটো ছাড়ি নাই। লয়ে আনি দেখাছিলাম। কেনি দিলাম ভোট আনি। বিশ্বাস যেলম, আর পুলুশ জুলুম উঠবে না, জোতদারি জুলুমে বিচার পাব। হাঃ! কারে বিশ্বাস যেলম ?

রতন ঘন ঘন বাতাস খায় ও বলে, সামন্ত গদীর ভাগ লিল, আর মারি দিল কালীবাবুরে। তুমারদের পার্টি বলথে গাঁ-গেরাম মুখ দেখত ওই কালীবাবুর। সেই ছুটাছুটি করি মরত। তারে মারি দিল, বেতুলরে মারি দিল, পুলুশ এখুন ডবল জুলুম উঠায়, আর জোতদার ? জোতদার তুমারদের চান্দা দিয়া পার্টির মদত

লিয়েছে। গরিব কিষাণ, খেতমজুরের পরে তিনোগুণ জুলুম চালাতেছে।

এর জন্যে তো আমরা দায়ী নই।

কার দায় তা রতন ডম জানে? মরলাম চরসার বানে। উ মাগী জানে বান ভাসাতে। বানে মরলাম, রিলিফ ছিটাছুটা—তেলা মাথা তেলে ভিজি গেল, রুখা মাথ ফাটি গেল—ফুট ফর ওয়াক দিবে শুনি কাম করতে চাহিলাম, কাম মিলল না, গম মিলল না। মানুসরে শুখা উপাসে রাখি গমটা ফিরায়ে দিছে শুনি, শুনি বেচি দিছে, তা কি হয়, কার দায় তা রতন ডম জানে?

ভয়ংকর, ভয়ংকর এই উন্মোচনের পর উন্মোচন। ইন্দ্রের ভেতরে জ্বলে যায় যেন। সব কি তা হলে প্রচার আর প্রচার? সৎ ক্যাডার, বিশ্বস্ত ক্যাডার তা হলে কি করবে? নেতাদের সঙ্গে রতন ডোমদের দেখা হয় না, ইন্দ্রের হবে, দীনুর হয়। কেন এই জোতদার তোষণ, যথাযথ কাঠামো রেখে চলার চেষ্টা? কোথায় ভয়? কেন ভয়? যারা ভোট দিয়ে পার্টিকে গদীতে বসিয়েছে তারা তো সৎ ও বিবেকী প্রশাসন চেয়েছিল? তারা তো সবাই পার্টির সদস্য নয়? জনগণের রায় পেলে দায়িত্ব স্বীকার করার কথা ছিল না সবার আগে? ইন্দ্র আস্তে জিগ্যেস করল,—

সামন্তদা জানে এ-সব?

কংগ্রেসের ফেলাগ উড়াবার মোটা খাম্বা রামেশ্বর ভূঞা। রামেশ্বর চান্দা দিয়া পার্টির খাম্বা এখুন। তাহার জীপ গাড়ি চড়ি সামন্তবাবু জাগুলা ঘুরি মালা নিল, আবির মাখল ভোটে জিতি, সামন্তবাবু জানে না? স—ব জানে। এখুন তো রতন ডমরে দরকার নাই তার। জানে, ফিন ভোটের কালে যাব, উ ডমটা, উজবকটা, জরুর খাটবে আমারদের লাগি।

বলে দেখেছ?

গেছিলাম। চার শালো কাওরা সানথালের বর্গা রেকড লাগি।

রোতোনি সাউর মিলল চা—র লাখ টাকা। আমরা লাথ খেলম। সুকুলবাবুটো ভি অপমান হই গোবমোন কাম ছাড়ি দিল। বহুত নাকাল হই যেলম।

দীনু বলল, যে কথা বলতে গেলম তখুন, সে কথাই বলছে উনি।

দীনুর মেসো বলল, আগে খেএ নাও কেনি? বানধা ভাত সমুখে লয়ে পরের বিত্তান্ত শুনতে লারি হে। ভাত বলো কথা? দোকান হতে পাতা আন কেনি দীনু?

দীনু শালপাতা আনে কয়েকটি। মাড়-না-গালা ভাত, ডাল ও আলুচচ্চড়ি। আলুচচ্চড়ি সামান্যই। তাব টাকনা দিয়েই ভাত খাওয়া হয়। ভাত খাওয়া হলে রতন পরম তৃপ্তিতে জল খায় এবং বলে, মাছ আনব কাল। ডিংলা, মাছ, লঙ্কা পিঁয়াজে খাই না কতদিন।

অষুদটো?—দীনুর মেসো বলে।

লাঃ।

আন নাই?

লাঃ, আর আনব ভি নাই।

দীনু ইন্দ্রকে বলে, উনি বাতের বেথার অষুদ ভি জানে। তেল পাড়ে দিবে, বেথায় আরাম।

আগে ইন্দ্র ছিটকে উঠত, এ-সব মিথ্যে সংস্কার। তেলপড়া, জলপড়া, মন্ত্র, তাবিজ, সব মিছে।

এখন ছিটকে ওঠে না। এগুলি বুজরুকি। কিংবা নিজেকে ভোলানো। এ-সব সেই মানুষেই আঁকড়ে ধরে, বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা যার নাগালের মধ্যে নেই। এখন ইন্দ্র ধীরে ধীরে যদি ওদের মধ্যে মিশতে পারে, তা হলে বরং দৈবে-মন্ত্রে বিশ্বাসগুলি যুক্তি দিয়ে সরাতে পারে। কিন্তু অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করার পর? 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে চলো' বলবে ইন্দ্র? স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গ্রামের গরিব কি পায়, কি থাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে? ওষুদ নেই, যন্ত্রপাতি নেই,

চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই, আছে শুধু পরাজিত, ক্লান্ত এক ডাক্তার এবং দেয়ালজোড়া রঙিন প্রচারপত্র। চব্বিশ পরগণার গ্রামাঞ্চল ঘুরে ইন্দ্র অনেক দেখেছে। আর সরকারি বিনিপয়সার ওষুদ গরিব-গুরবোকে পয়সা দিয়েই দিতে হয়।

এ-সব জানে বলেই ইন্দ্র কিছু বলে না। কিন্তু রতন যা বলে, তা শুনে ও অবাক হয়ে যায় বেজায়।

রতন বলে, ধুর! ঘিন উঠি গিছে মনে। আর অষুদ করব নাই। আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা অষুদের লাগি বরাদ্দ। দিছে নাই যখুন, তখুনি ঘিন আসি গেল। ই বাবুটোরে বলি, দীনু কম ছুটে নাই ডাক্তাররে তাসায়ে অষুদ বেবস্থা করতে। তাতে নবীনবাবু, আঃ, মুটা হছে কি! নবীনবাবু উরে বলি দিছে, তাসানা, ডর দেখানা, উ নকশালী বাহানা ভুলি যাও। শান্তির পথে চল। তা, এক সময়ে তো খুব লেচে বেড়াত সভে, অ্যানেক আগে। জিনিসের দাম বাড়ল, লড়াই করি নামাল। রামেশ্বরের বাসের ভাড়া বাড়ল, লড়াই করি নামাল। এখুন শুধা বলে, হাংনামা কর্যে না যেনি—উ নকশালীরা করা গিছে। শান্তির পথে চল।

ইন্দ্র হেসেই ফেলে একটু।

রতন বলে, হঁা হঁা, হাস বাবু। হাসির কথা বেটেক্। হাস! তা শুন্ সদানন্দ! আমার পরিবার, উ মাতোর মা বলে, কুনো দিন শুনি না। সিদিন বলতেছে, হা তুমার জনম এক ভাবে গেল? মোর কথা কখুনো—লিল্যে না। অষুদ দিছ কেনি দশজনারে? অষুদ যি জানে, কপাল তার বশ। তুমার—যদি অষুদ জানা আছে, তবে তো কপালটো বশ করিছ। তবে কেনি স্ত্রি-পুরুষে ছিঁড়া-ফাটা বস্তর পরি? জাড়েহিমে ধুলাট খোসলা গায়ে দেই? কেনি প্যাটে ভাত, মাথায় তেল জুটে না? বাস্! ইয়াতে চক্ষু মোর খুলি গেল রে। বুঝাটো, গাধাটো, আমি নাকি? মাতোর মা ই কথাটো জ্ঞেয়ানের কথা বল্‌ছে?

অষুদে কতোজনারে আরাম করছিস ?

অষুদের গুণ ? না আপনি আরাম হচ্ছে ?

অষুদের গুণ।

মনটো উঠি গিছে। অষুদ জানলে সি অষুদ আমি পারি, তো হঁা! এমন অষুদ জানব, যা হতে পেটে ভাত মিলে, পরনে বস্তর। লয় তো আন অষুদে কাম করবনাই।

গুম্ হয়ে যায় রতন, এবং এতক্ষণে একটি বিড়ি ধরায়। বলে, মনটো ভাঙি গিছে খুব।

দীনু বলে, রোতোনির কথাটো বল কেনি ?

রতন তিক্ত হেসে বলে, হঁা! সি বিত্তান্তটো শুনি রাখার মত নেটেক্। ই কথা সি শুনবে সি জানবে রতন ডমের তুল্য বোকাটো সির্জেনাই কেও।

কাহিনীটি সংক্ষেপেই বলে রতন।

বন্যা এল, বন্যা গেল। ফুড ফর ওয়ার্ক ব্যাপারটিতে প্রথমে মানুষ খুব উল্লিসিত হয়। কিন্তু দীনু যদি সাচাই হয়, গৌর, কদম, রজত যদি সাচাই হয়—আর রতন হাজার বার বলবে এরা খুব সাচাই· খুব বিবেকী—এরা যদি সাচাই হয়, তা হলে সাচাই কথা বলুক। ফুড ফর ওয়ার্ক কার্যসূচীতে যত গম এসেছিল, তা সবাই পায় নি।

দীনু বলল, সবাই কাজ করে নি।

নিমেষে রতনের ব্যক্তিত্বে রূপান্তর ঘটল। চাপা গলায়, সগর্জনে ও বলল, কাম সবে পাই নাই। চাইছিল।

কাজ দেওয়া হয় লোক বেছে, গমও পায় তারা। কিন্তু যে সংখ্যক লোক কাজ করে, যে পরিমাণ গম বিলি হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি লোক কাজ করতে পারত। গম অনেক বেশি ছিল। বহু উপোসী লোককে উপোসে শুকিয়ে সে গম উধাও হয়ে যায়। গৌর ও রজত এ নিয়ে যথেষ্ট ঝগড়াও করে।

সেও গেল, সে অধ্যায়।

ব'নের দুখ আমরাদের বারমাসিয়া করি রাখছে যেনি' বার-মাসিয়াটো বুঝ বাবু? দুখী—ভুখা মানুষ যেয়্যা জমি মালিকের, কারবারীর ঘরে বারমাসিয়া হয়। কে বলে বারমাসিয়া, কে ব'লে মাহিন্দার, কে ব'লে ভাতুয়া। দেশ যত, নাম ভি তত। তা দুখীভুখা মানুষ, কিছু নাই যার ঘরে, সে যেয়্যা বারমাসিয়া হয়। বাবু গ! বারমাসিয়া করি রাখ মোরে, ভাতের দুখ আর না সহি পারি।

ভাতের দুখ সবার বড় দুখ। ই এত বড় পিথিমি।

ধানখেত ভরি রাখি দিছে কে? ই রামশালি, জটাশালি, কনকচুর, ঝিঙাশাল, তিলসাগার, কথো নিধি ধান, কথো নিধি চাল কার বেবস্থা? সকল ধান বুনে কে, খেত নিড়ায় কে, কাটে ধান? কে তুলে গোলায় বাবু? খায় কে? কার বেবস্থা? মোরাদের জুটে না কিছুতে পেট ভরাতে—কার বেবস্থা? তোমরা কথো দুখের কথা কহ বাবু, বুঝি পারি না। কুন্ বা দুখে বেরাগি হয় মানুষ, কুন্ বা দুখে আপুঘাতী হয়? মোরা ভাতের দুখে দুখী বাবু, মোরা বেরাগী হই না, আপুঘাতী হই না, ভাতের সপন দেখি চিঁড়া খোসলা গায়ে দিয়া, সপনে পাকা ধানের সুবাতাস বহি যায়, মনটো জুড়ায়।

ভাতের দুখে বারমাসিয়া হও তো গোলাম হই গেলে তুমি। সালিয়ানাদার কি দরমাহাদার তাতে কি আসি যায় বাবু? পেটে খাও মাহিনা লিবে, কিন্তুক বারমাসিয়ার মিলে না ছুটি দিনেরাতে। আর যখুন বল, পয়সাটো তো দরকার লাগে কি না বল বাবু! টোকা বিটির অসুখ, কার বা বিয়াসাদী, কার জাতকরম, কার ছরাদ, জনা-জনা রকম-রকম কামে পয়সা চাহি, আর এক কামে সবার চাহি পয়সা—নিজে পেটে খাও, ঘরে তারা ভুখারুখা মরে শুকায়। পেট পুরাতে পয়সাটো করজ দেয় মনিব—সি করজে সুদটো লাফায়ে লাফায়ে বাড়ে গ! বারমাসিয়ার করজ শুধে না। মরার কালে ছেলাটারে বারমাসিয়া করি রাখি যায়। ই যদি গোলামি-বান্দা-

গিরি নয় তবে কুন্‌জনারে বলবে গোলাম ? তাতে গাতি—

বারমাসিয়া রে ! তুর দুখে পাষাণ কান্দ্যা
পাখপক্ষী কান্দ্যা
পোকপতং কান্দ্যা
বিক্ষলতা কান্দ্যারে বারমাসিয়া !
তুর চোখে জল, তুর মনিব হাসে
মনিবের কুকুর হাসে, বিড়াল হাসে
ঢেঁকি হাসে, হামার হাসে
মনিব্যান্‌ হাসে কাখে !
মনিব্যানের পায়ে পিতলের মল গ !
মলটো ঝন. ঝন. বাজে মিঠা মিঠা হাসে ॥

চরসার বাগানের কথা বলতে এত কথাই বলে গেল রতন ডোম। রতন ডোমের কথা বলার ধরনটি আশ্চর্য মন-কেড়ে-নেয়া। শ্রমিকরা শহরে যায় জমি খুইয়ে পেটের জ্বালায়, তা উন্দ্র জানে। শিল্পাঞ্চলের লড়াকু শ্রমিক ইউনিয়নের লড়াই করে, দাঙ্গার ইজ্জৎ রাখে। কিন্তু তাদের স্বপ্নের কথা তুমি জানতে পার না। ভাবলে খুব অবাক লাগে তোমার। তুমি তো ওদের সাথের সাথী, বন্ধু। সব জান। ওদের দৈনন্দিনতার সংগ্রামের হিসাব তোমার রক্তের কণাতেও লেখা হয়ে চলে। সব জান, কিন্তু স্বপ্নটা কি তা জানতে পার না। আর অবাক হয়ে যাও তখন। স্বপ্নটার পরিচয় জানতে ইচ্ছে করে। এই সব চেনাচেনা কালিঝুলি মাখা মুখগুলো কোন কোটিকার কোন কক্ষে বন্দী রেখেছে স্বপ্নগুলি।

তারপর একদিন হঠাৎই জানা হয়ে যায়। হোলির রাতে হোলিমাতাল মনোহর যখন গান গায় ঢোল বাজিয়ে নেচে নেচে, সকলের সঙ্গে বসে তুমি পেটো করতাল, তখন চম্মন রবিদাস স্বপ্নিল চোখে ছাপরা জেলার সিরাহি গ্রামে হোলির শোভা দেখতে দেখতে অস্ফুটে বলে, আর এক বছরে ধার শোধ করে ফেলব। তারপর

আর কি! জমি কিনব, কিনতেই হবে। বেশি নয়, তিন বিঘা জমি থেকেও বছরে চার মাসের খোরাক তো উঠবে।

ওর গলার স্বরে থাকে আকুল পিপাসা, আর হঠাৎ তোমার সামনে ঝলকে ওঠে একটা সত্যি কথা, যা তোমার রাজনীতিক পাঠক্রমে নেই। তুমি শিখেছ মজুর মজুরই থাকে, কিষাণ থাকে কিষাণ। সে তো তত্ত্বের কথা। ছোট ও মাঝারি কলকারখানায় নিযুক্ত মজুর আসে শিল্পাঞ্চলে—জমি থেকে বঞ্চিত হয়ে। জমির তরে হাহাকার থেকে যায় তাঁর করোটিকায়, হৃদপঞ্জরে, সন্ধ্যার নেশার কালে, রাতে স্ত্রীর সঙ্গে মিলে যাবার মোহনায়। এ রূপান্তরভবনের একটি পর্যায়। এ পর্যায়ে যে কিষাণ, সে মজুর। মজদুর-কিষাণ এক হো—হ্যাঁ, এ পর্যায়ে মজদুর-কিষাণ এক মানব-দেহেই এক থাকে। মিলে মিশে। কত র‍্যাদা-পালিশের পর অন্তরতম স্বপ্নেও সে মজদুর হবে, তা তুমি জান না!

এই নতুন সংজ্ঞা তোমার আবিষ্কার। যান্ত্রিক তত্ত্বপাঠের সময়ে তুমি জানতেও না যে তুমি এক ভারতবর্ষ আবিষ্কার করবে, যে ভারত কৃষিভারত।

এই নতুন আলোয় তোমার শেখানো তোতাবুলি টলে যায়। আর হামিদের ঘরে ইদের নেমন্তন্নে গিয়ে তুমি যখন দীর্ঘকাল বাদে একটু প্রোটিন খেয়ে বেজায় খুশি—তখন হামিদ বলে, পরবে-টরবে বেশি খরচ করছি না এ বছর। এবার জমিটা খালাস করতেই হবে। আহা কি জমি!

শিল্পাঞ্চলের এই সব লোকজন ইন্দ্রকে অনেক আগেই জমিজীবী মানুষ বিষয়ে আগ্রহী করে দিয়েছে। ইন্দ্র তাই, গভীর আগ্রহে রতনের কথা বলা লক্ষ্য করে।

কি আশ্চর্য মন-কেড়ে-নেয়া জাদু ওর কথা বলায়। বানের কথা বলতে গিয়ে বারমাসিয়ার কথা। ভাতের দুঃখের কথাটি গভীর বেদনায় বলে যাচ্ছে ও, কিন্তু যেন রূপকথা বলছে। রূপকথাই তো,

রূপকথা। রূপকথা তো কোনোদিন পুরনো হয় না। কনকসালি, রামশাল, রূপনারায়ণ ধানের পাহাড় কেটে যারা পরের খামারে তোলে, সেই রতনদের ভাতের দুঃখও তো রূপকথার মতোই। বহু প্রাচীন সে কথা, আজও তা বেঁচে আছে। ইন্দ্রের এখন আকস্মিক-ভাবে মনে হয় বহুকাল বাদে তার হতভাগিনী মায়ের কথা। মা মুড়ি ভাজতে ভাজতে মাঝে মাঝে মৃত্যুবিলাপের মতো বিস্বরে একটানা গাইত,

কারো অন্যে দুধ বাতাসা

আমার যে মা শাক জোটে না—

মা এই একটি রামপ্রসাদীই ভুলভাল জানত, ভুলভাল গাইত। মা বহুকাল হল মরে গেছে। ক্যানসার হয়েছিল পেটে। জীবনে যে শুধু দুঃখ পেল, মৃত্যুও তার কাছে ওই ভীষণ ব্যাধির চেহারায় এসে শরীরকে অশেষ কষ্ট দিয়েছিল। কার বেবস্থা বাবু গ? মা ছিল বেজায় ভীরু ও ঠাকুরদেবতা ভক্ত। মায়ের পরিণাম দেখেই ইন্দ্র ভগবানকে মন থেকে ছেঁটে বাদ দেয়। নিরীশ্বর হবার জন্যে তাকে কম্যুনিস্ট হতে হয় নি। নিরীশ্বর হয়েই সে পার্টিতে আসে। পার্টিতে ঢোকার পর ঈশ্বরকে ছাড়তে গেলে ঈশ্বর সাঁইবাবার মাধ্যমে গিন্নির আঁচল ধরে বাড়িতে ঢোকেন। সামন্ত এবং তার রাজনীতিক চেতনিক পরিবার।

রতন বলল, কি বলতে কি বলতেছি, ডম-কাওরার বেপার। মাপ করি দিও।

বল: আমার খুব ভালো লাগছে।

কেনি?

অনেক কথা জানি না বলে।

চরসার বানের কথা! তা, বানটো তো আমরাদের বারমাসিয়া করি রাখছে। বানের কাছে মোরা বারমাসিয়া, খরার—আকালের কাছে ভি বারমাসিয়া। বানটো এল, গেল। পেলয় বান সি,

এমুন দেখিনাই কখুনো। তা বাদে যা হল তা বলি। না রিলিফ, না কাজের বদল গম—মনটা ভাঙি গেল খুব। সামন্তবাবুর কাছে গেলম সবে মিলি। দিলীপ সোরেন দরখাস্ত লিখল। টিপছাপ দিলাম। উ বাবা! ব্বাপো রি ব্বাপো!

কি হল সেখানে?

সি চ্যাহারা, সি মানুষ, কিন্তুক ই কুন্ সামন্ত? বলে, সব মিলছে তুরাদের। নকশালী গরম দেখাতে আর্জিটা লয়ে আসছিস। গরম দেখাই নাই, মিলে নাই, মিলে নাই ভি কিছু। তাতেও ই কথা শুনি আশ্চজ্জ গেলম। বললম হঁ বাবু। ভোট নিবার কালে তো এমুন গরম হও নাই? গদীতে মিলছে আর ভুলি গেলে সব?

কি জবাব পেলে?

বলে, তুব খুব বাড় বাড়ছে রতন! কিছু করি নাই বলিস? সুখর গমস্তাকে কাটছিলি, তাথেও ধরা করাই নাই—উদ্ধবটা বসাই টুডুর সাথ-সাথ ফিরত—তারেও করি নাই কিছু। দিলীপরে চাকরি দিছিল, নেয় নাই, তারে ধরি নিছে উ সান্থাল, বুঝি বা নকশালী উটায়।

তারপর?

বললম, সামন্তবাবু! কামটা ভাল কর না। ভোট ভি দিয়াছি আর সকল কামে সামিল হতে ভি চাই। কবে কি হাছিল, সেই কথা ধরি বসি আছ।

বলতে বলতে রতন একটু থেমে ভুরু কঁচকে কী ভাবে ও বলে, মনটা ভাঙি যায়। বলতে পারতম, তুমারদের ছেলা, উ গৌর—উ কদম, উয়াদের শুধাও কেনি, চরসার মানুষরে যখন বলল, নকশালী করছ, বসাই টুডুরে মদত দিছ, সি কথা ভুলি যাব। জানি বড় দুখে হাতিয়ার ধরছিল। আর কথা দেই, যত ছেলাদের জেহেলে রাখছ, খালাস দিব। জমির মালিকদের নয়, তুমারদের মদত দিব। সকল দিকে সুসারটা করি দিব।

ইন্দ্র খুব মন দিয়ে শোনে। নির্বাচনী এলাকাও থাকে বিচিত্র বিভাজ্যতায় মেলানো-মেশানো। একই নির্বাচনী এলাকার একেক জায়গায় একেক কথা বলতে হয়। কাঁকড়াসোলে যে কথায় ভোট চাইতে হয়, সে প্রতিশ্রুতি সমস্যাদীর্ণ, সংগ্রামসংকুল, রক্তঝরা চরসার প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বলা চলে না। নেতাদের বিরুদ্ধে তারও আজ অনেক বক্তব্য মনে মনে। পার্টিকে ভালোবাসে বলেই মনে জমে ওঠে বক্তব্য। রতনের কথা শোনা খুব দরকার।

—বলতে পারতম, গৌরবে কদমরে শুধাও, জানি পারবে তুমার কথায় বিশ্বাস যেছিলাম গ! ভোট দাও সামন্ত বাবুরে, ইবারে রোতানি সাউ, রামেশ্বর ভূঞার দাপট রবে না আর। 'ভোট দাও' বলি কত ঘুরছি সভা করছি। সামন্ত বাবু গ! তুমি জিতে যাও, মোরা শুখা পেটে সানথালদের ধামসা বাজায়ে জয়জোকার দেই। তা বাদে, তুমারদের সরকারটোর সকল কামে আগাই— সকল ভুলি গেল। তাথেই মনে দুখটো। সিদিন বললম ভোটে যে জিতে সে তয় বাবন। ঘরে ফিরে নাই।

সদানন্দ যেন অবাক হয়ে পুরনো কথা স্মরণ করে বলল, নাঃ। ঘরে ফিরে নাই উ। মোর তথ মদ খেতে ভি আসে নাই। যা করছিল তা তাজ্জব বটে।

চরসার চরে গিয়ে চুপ করে বসেছিল রতন। কেন বসেছিল? সে কথা শুধালে বলেছিল, ভোটমাগা বাবুদের স্বরূপ তো সে ভালোই জানে। তবুও সামন্তকে ভোট দিয়েছিল পাঁচজনের কথা ভেবে। গ্রামের মানুষের জীবন তো বহুকাল ধরে বিপর্যস্ত। সামন্তকে ভোট দিলে পুলিশের ত্রাস কমাতে পারে, বন্দী ছেলেগুলি ফিরতে পারে ঘরে। চরসা নদী সব জানে, ওর মনের কথা। তাই চরসার কাছে কাঁদতে বসেছিল। এত বড় দুঃখ মদ খেয়ে ভোলা ঠিক নয়। আর ভুলবেই বা কেন? মনে রাখতে হবে যে।

দিলীপ সোরেন ওর হাত ধরেছিল। বলেছিল, চল কাকা,

ঘরে চল। আরো কাজ আছে। তুমি আমাদের মাথা, তুমি বসে থাকলে চলে না। ঘরে চল।

কুচকুচ শব্দ হচ্ছিল।

উ কি?

রতন চমকে উঠেছিল।

মুড়ি চিবাই। নাও, মুড়ি পিঁয়াজ খাও।

মুড়ি ও পেঁয়াজ খেতে খেতে রতন ঘরে ফিরেছিল। গাল দিয়ে বলেছিল, তু হারামি চাকরি পেয়্যে করলি নাই—তাথেই সামন্ত গরম হই গিছে।

দিলীপ বলেছিল, লঙ্কা নিবে? মুড়ির সাথ লঙ্কা না হলে হয় কখুনো? নাও, নাও না।

গ্রামে ওরা ফিরে যায়। অনেক, অনেক দিন কাটে। সময়টা যে কেমন করে কাটল তা বলতে পারে না রতন। হ্যাঁ, বুঝি বা মনস্তাপে, কিংবা ভুলের বশে, সামন্ত একটা কাজ করে ফেলে। গ্রামীণ শিল্প প্রদর্শনী যখন হয় জাগুলায় ছেলেদের বলে, ন্যায্য দামে জিনিস বিক্রি হতে হবে, গ্রামীণ কারিগর যেন পয়সা পায়। আর চরসার রতন ডোমকে বল, বাঁশের ও বেড়ার একটা দেখার মতো প্রদর্শনী ঘর তৈরি করাক সব ডোমদের দিয়ে। কাঁচামাল আনুক, দড়িদড়া দাও তোমরা—টাকাটা অর্ধেক ধরিয়ে দাও, বাকি অর্ধেক কাজ হতেই দিও।

রতন ভেবেছিল কাজটা করবে না। দিলীপ কিন্তু গৌর, কদম, ওদের সঙ্গে জাগুলা হাঁটাহাঁটি করে এবং রতনকে বলে, দশ পনেরো-জনা মিলে ঘরটা তোলো, বাঁশ কাটতে চিরতে আরো বিশজনাকে নাও।

কত টাকা দিবে সামন্তবাবুরা?

তা ধর, চার হাজার টাকা।

কি বলিস তু?

চার হাজার।

হঁ্যা, দিবে মোরাদের।

দিলে করবে ?

দিক। টাকাটো দেখি আগে।

টাকা দেখেছিল রতন। ওরা বিশজনেই সব কাজটি তুলে দেয়। হ্যাঁ, চার হাজার টাকাই মিলেছিল। দুশো টাকা একেক জনে পায়। এমন অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায়।

ঘরের বা কি শোভা হয়েছিল। কর্তাল ডোম বলেছিল, মায়ের মন্দির লামায়ে দিব চক্ষের ছামুতে।

বাশুলি মন্দিরটি কাঁকড়াসোলের সীমান্তে। বড় শোভার মন্দির। চূড়ার ওপর চূড়া. দু পাশে দুটি পাথরের নৌকো। ওই নৌকো দুটি চড়ে নাকি দেবী বাশুলি তাঁর সখীদের নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আকাশ পথে ভেসে এসে ওখানে স্থিতা হন। দেবীর আদেশে ভূঞা রাজা গড়েন মন্দির।

রতনরা এই পরিচিত মন্দিরের ছাঁচেই ঘরটি তৈরি করে। কর্তালের নির্দেশে। বাঁশের ও বেড়ার ঝাঁপের সে এক আশ্চর্য মন্দির। টুনি বালবের মালা গায়ে জড়িয়ে মন্দিরটি ঝলমল করে। অনেক প্রশংসা করে অনেকে। মতিবাবু অবশ্য বলে, তোরা তো মাথাকাটা পার্টির লোক। এ-সব কাজ ভুলিস নি দেখছি। করলেই পারিস ?

রতনের মনের প্রসন্নতা ছিঁড়েখুঁড়ে রাগ রি রি করে উঠেছিল। সে বলেছিল, করালেই পার।

যা করাই তাই করিস নাকি সবসময়ে ?

লিচ্চয়। উপাস করাও, উপাস করি। কাম রইতে কাম না দিয়া জাহানে মার, মরি। আবার টাকা দিয়া কাম করালে, সি কামও করি। তুমরা তো ভগবানটো এখুন।

মতিবাবুর কথায় রেগে চটে রতনরা চলে আসে। জাগুলায়

অনেক উৎসব, অনেক প্যাণ্ডেল হয়েছে তারপর।

রতনদের আর ডাক পড়ে নি।

মদত মিলে না গ বাবু, মদত মিলে না। আগে রাজা-জমিদারে পালা-পরবে কত বা রকম রকম চেগার তৈয়ারির বরাত দিছে, বানায়ে দিছি। দেশের জিনিসটা মদত মিলে না বলি বানাতে পাই না গ বাবু! তুমারদের নয়ানূতন পালা পরব এখুন। সভার অন্ত নাই। দেশ ঘরের জিনিসে ইন্দরসভার সাজ, তুমরাও মদত দাও না। মোরা যা জানছি, ছেলাদের শিখাই না—শিখায়ে লাভ? ডালা, কুলা, চেঙারি, ঝুড়ি শিখাই।

ধরমরাজের মেলা বসে জাগুলায়। মোরা বহে লয়ে যাই ধরমের ধ্বজা। ময়ূর, মাছ, হাতি, নানানিধি ধ্বজা বহে লই। সি ধ্বজা দেখি কত ভালো বল তুমরা, ছবি উঠাও ফটফট! কিন্তুক মদত দাও না। ই সকল হয় কার বেবস্থায়?

এ ভাবেই রতন কথার পর কথার জাল বুনে চলে। আব এখন ইন্দ্রের হঠাৎ সন্দেহ হয়। ও বলে,

রতনদা! তুমি কি অনেকদিন বাদে পেট ভরে ভাত খেলে?

রতন দুর্জ্ঞেয় হাসি হাসে, কেনি? ভাব কি ভাত খেয়্যে লেশা ধার গিছে, লেশায় কথা বলি?

হ্যাঁ।

বুঝ নাই।

কি বুঝি নি।

কেনি বলি কথা।

কেন? তুমিই বল।

রতন আবার তাচ্ছিল্য ভরে হাসে। বলে, শালো, তুমারে বুঝাতে চাহি যি পার্টির কামটো কর আসি চরসা বসি। দেখ, কুনো সরকারের সাথ মোরা সাধি বিবাদ করি না। 'লকশালী' লামটো ভুলি যাও। তারাদের সাথ সামিল কেন হছিলাম, কুন বা দুখে,

তা দেখ। দুখের কারণগুলি আসান করি, দাও কেনি? বাস! মোরা জান লড়ায়ে দিব। যি জনা দুখে সাথে রবে, তারে মদত দিব। এত কথা বলি, জানপহচানটো করি লাও কেনি? না শুন যদি, জানবে বা কেমুনে?

বল, জানতে পারছি সব।

ভাতের লেশায় ঘুম আসে, কথা আসে না।

কি জানি, ভাত খাচ্ছি তো ক-দিন।

সি কি কথা?

রুটি আর পেঁয়াজ খেতাম।

হোঃ, কতদিন?

অনেক বছর ধরে।

রতন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়। বলে, জেহেলে ভাত দেয় নাই? জেহেলে তো আছিলা।

তা দিত।

রুটি আর পিঁয়াজ! সেথা চাল নাই?

আছে। কে রাঁধে?

বাবু! অন্নটো লক্ষ্মী। ছিল চাল। চাহিলে খেতে পারতা। খাও নাই। তাতে ভাতের দুখ বুঝ না। ভাতের মরমটো সাঁধান পাও না।

তাতেই বল, ভাতের নেশায় বকে ডমটো।

বল রতনদা, রাত বাড়ছে।

সদানন্দ এ সময়ে গলা ঝেড়ে কাশে ও বলে। আমি শুলম বাবু, চক্ষু বুজি আসে।

রতন বলে, ধুস্ শালো!

তুমি পার, আমার ক্ষমতা নাই হে।

সদানন্দ শুয়ে পড়ে এবং সঙ্গেসঙ্গেই ঘুমোয়। রতন কি যেন ভাবে ধোঁয়াটে লণ্ঠণটির দিকে চেয়ে। তারপর বলে, এত কথায় কাম

কি ? সি কথাটো বলি। ই এক বিত্তান্তে দীনুর মত বহুত ছেলার, বহুত সাচাই ছেলার মন ভাঙি গিছে আর এখুন, যার মন ভাঙে সি হয় লকশাল। ই বা কি, বাবু ? তুমার পার্টি আর লকশালী আর কংগ্রেসী ? ইয়ার বাহিরে কেও নাই আর ? ইয়ার বাহিরে ভি অগণন মানুষ হে ! সুকুলবাবু কুনো দলে ছিল না, আজও নাই।

সুকুল উকিলের কাহিনী বা অভিজ্ঞতাটি খুবই দ্যোতক এ কাহিনীতে। সেই কথা শুনেই ইন্দ্র নিজের মন ঠিক করতে পেরেছিল।

বানবন্যার পর অনেকদিন কাটে। প্রশাসনে পারবর্তন আসবে, সে প্রত্যাশা নিভে গিয়েছিল রতন ডোমদের। ঠিক আগেকার মতো চলছিল সব। আগেকার চেয়ে মন্দই চলছিল। অথবা ভালো। আসলে মন্দ আর ভালো বলে কিছু নেই ইন্দ্রবাবু। একই জিনিস রামের পক্ষে ভালো, শ্যামের পক্ষে মন্দ। রতনের বয়েস তো কম নয়। এখন যেখানে 'নারায়ণী' সিনেমা হল দেখছ, দেখ নি ? দেখে এসো। জাঁকজমকের হল ওটি। ওর সামনে রতনের ছেলে, সেই হতভাগা মাতো ডোম রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবুর চটির রঙ কেমন, চুলের ফেশান কত !

এখন যেখানে 'নারায়ণী' সিনেমা হল দেখছ, সেখানে ছিল গজাড় জঙ্গল। জাগুলার নাম ছিল ভূএগ্রাজাগুলা। সেদিনও জাগুলাকে শহর বলা হত, কিন্তু তা ছোট্ট শহর। অনেক দেখেছে রতন ডম। এখন যেখানে হাইওয়ে বাসজংশন, সেখানে হাতি দেখতে আসত রতনরা। হাতি চরত ওখানে ভূএগ্রারাজাদের। বাঁশঝাড় ছিল, হাতি বাঁশের কচি ডাল, পাতা খেত।

ভালো কাকে বল বাবু, মন্দ কাকে বল ? এখন পুলিশ হয়েছে সামন্তবাবুদের জামাই। পুলিশের গায়ে কাঁটার আঁচড় গেলে বাবুদের চোখে জল ঝরে। পার্টির ছেলেদের তখন দনাদন মেরেছে

পুলিশ। পার্টির ছেলেরা এখন নিতাই-গৌর-সব ভুলে গেছে। তারাই দেয়ালে লেখে, পুলিশের ওপর অবিচার অত্যাচার শক্ত হাতে রুখতে হবে।

এতে পুলিশের ভালো, পার্টির ছেলেদের ভালো না মন্দ তা রতন জানে না। ছেলেগুলো আকাট বোকা, চিন্তা করার ক্ষমতা নেই, দেখার চোখ ও চিন্তার মস্তিষ্ক পার্টির কাছে বাঁধা বলেই রতনের বিশ্বাস।

পুলিশের ভালো। পুলিশ ঘুষ খাচ্ছে, গরিবকে ঠ্যাঙাচ্ছে, চোর-বদমাশ-পুঠেরা-ছিনতাই দল-মস্তান-ঠক-সকলকে মদত দিচ্ছে।

রতনদের মন্দ। তারা মার খাচ্ছে। এই রকমই সকল বস্তুতে, বুঝলে বাবু? গৌর কদম, রজত, দীনুর মতো ছেলেদের বুকে পাষাণ চেপে যাচ্ছে। ওরা তো গাড়ি চাপা, কালো চশমা পরা হাতঘড়ির দিকে চোখ রেখে 'কমরেড! বন্ধু ভাই!' বলে দু মিনিটের বক্তৃতায় অঞ্চলের প্রাচীন সমস্যার সমাধান করা পার্টিবাবু নয়। ওরা পায়ে হাঁটা ক্যাডার। মানুষের মুখোমুখি হতে হয় ওদের।

জাঙ্গলা তো এখন ঠিকাদার-কালোবাজারি-মস্তানের হাতে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। ওষুধপত্তর মিলে না। পারমিটে মিলে না কেরোসিন। রতনদের মন্দ। কাদের ভালো তা ইন্দ্রবাবু! তুমি বুঝে নাও।

ই সকল হতেছে কার বেবহায়?

অনেক দিন ধরে রতন সেই লোকটাকে খুঁজছে। সেই অদৃশ্য লোকটাকে। যার ব্যবস্থায় এ সব হয়, হয়ে চলে। ওর খ্যাপামির কথা জানত বসাই টুডু। গম্ভীর মুখে ওর সব কথা শুনত আর বলত, ই কি কথা হলু একটা? তাহার সাঁধান তো পেছি আমু। তাহার মুকাবিলাই তো করি।

বসাইয়ের কথা থাকুক। সে সব কথা বুঝবে না ইন্দ্র। এখন শুনুক সুকুলবাবুর কথা।

অ-কো—৪

সুকুল সাঁতরা এই শহরের এক দুঁদে উকিল। না, কালী সাঁতরার কেউ নয়। মনে পড়ছে ইন্দ্রর? সেই যে যার বাড়ির ফটকের মাথায় ল্যাজ পাকানো সিংহ আছে সিমেণ্টের? সুকুল সাঁতরার বাবা বিক্রম সাঁতরা বাড়ি বানায়, ফটকে সিংহ বসায়। সুকুল সাঁতরা বড় উকিল। জমিজমা সংক্রান্ত আইন খুব ভালো বোঝে। মাঝে মাঝে, কেন তা রতন জানে না, মাঝে মাঝে সুকুলবাবু একেবারে ন্যাড়াবোঁচা পার্টির কেস নেয়। মোহনচাঁদ বাগাড়িয়া বনাম উদ্ধারণ ভূঁইমালী কেসটি যেমন। উদ্ধারণই জিতেছিল কেসে। তারপর অবশ্য উদ্ধারণকে টাকা দিয়ে বাগাড়িয়া সে বিতর্কিত জমি দখল করে নেয়।

এবার বানবন্যার অভিজ্ঞার পর রতন ভুলেও ভাবে নি তার দমে যাওয়া মন আবার উলসে উঠবে কোন কারণে। কিন্তু হঠাৎ শহরের পথের মোড়ে, আদালত ও মিউনিসিপ্যাল আপিসের পাঁচিলে, বাস জংশনের মোড়ে, সব দর্শনধারী জায়গায় ওঠে মস্ত মস্ত হোর্ডিং। অপারেশন বর্গাদারকে সফল করার জন্যে জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে বলে প্রবল চিৎকারে স্বাস্থ্যদীপ্ত মোটা মোটা কালো হরফগুলি। 'বর্গাদার' শব্দের রেফ দেখে বোঝা যায় এগুলি লেখার ঠিকাদারি কে পেয়েছে। শোভন ষড়ঙ্গীই এ শহরে রেজিম থেকে রেজিমে ব্যয়বহুল হোর্ডিং লিখে থাকে তার 'কপালকুণ্ডলা আর্ট স্টুডিওতে'।

শোভনের চুল হাঁটু অবধি লম্বা। সাধারণত ও চূড়ো বেঁধে রাখে। অবরে সবরে স্টুডিওর সামনে চেয়ার নিয়ে বসে চুল শুকোয়। ও বলে, ওর পূর্বপুরুষ অভিরাম ষড়ঙ্গী ছিলেন ছয় ফুট লম্বা এবং তাঁর চুল ছিল গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা। সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের ধারে তিনি চুল শুকোচ্ছিলেন আর তাই দেখেই বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার প্রথম বর্ণনায় ও রকম চুলের কথা লেখেন। কাহিনীটির সত্যাসত্য কেউ যাচাই করে নি। শোভন অবশ্য

রবীন্দ্রনাথকে ওর আত্মীয় বলে থাকে। যা হোক, ও বাড়ির নাম 'রবীন্দ্রকুঞ্জ' এবং স্টুডিওর নাম 'কপালকুণ্ডলা' এবং সাইকেলের নাম 'ধর্মেন্দর'।

শোভনই ধর্মরাজের মেলায় রতনকে বলে, এবার সবাই রাজা হয়ে যাবে। জমি পাবে।

রতন বলে, শুধা জমিন? ঘরবাড়ি, খামার, বাগান, গাইমহিষ, কত নিধি পাব নাই?

পাবে না মানে? আলবত পাবে। এবার সব শালার বেনাম জমি কেড়ে নিয়ে খাস করবে সরকার আর বেঁটে দেবে তোমাদের। আর যত জন বর্গা করে, সবার নাম রেকর্ড হবে। নাও, সর দেখি দণ্ডবতটা করি।

শোভন ষড়ঙ্গী বছর বছর ধর্মরাজের সামনে এসে থানটি ঘিরে দণ্ডী কেটে কেটে দণ্ডবত করে। তারপর তার ওপর ঠাকুরের ভর হয় এবং চুল খুলে ও নাচে। সেই ভরের সময়ে ও অনেক রকম আপ্তবাক্য বলে।

শোভন ষড়ঙ্গী বললে রতনরা অত গুরুত্বে বিবেচনা করত না প্রসঙ্গটি। কিন্তু হাটে বাজারে-পথে সর্বত্র কথাটি ক্রমে শোনা যেতে থাকল।

তারপর চরসার চেনা মানুষটা চলে এল। গৌর, কদম ও দীনু। ওরা বলল, যা শোনা গেছে তা সত্যি।

রতন কি তা মানতে চায়? ঘরপোড়া গরু ও। ও ভালোই জানে, যে যা দেখে ও ভয় পায় সেটা লাল মেঘ নয়, আগুন। রতনের জীবনদর্শন খুব পরিষ্কার। বিপদ দেখলে ভয় পাবে। আবার যখন দেখছ চারদিকে যেন ভালো-ভালো ভাবের বাতাস বইছে, তখন দুনো ভয় পাবে। নিরন্ন দুখীর জীবনে বড় বিপদগুলি বন্ধুর বেশেও হাজির হয়। হঠাৎ সরকার গরিব-দুখীর কথা ভাবছে কেন? নিশ্চয় কোনো হুড়কো আসছে।

কদম-বলল, না না, দেখ কেনি ই বার ?

কি দেখাবে বাপ ? তুমরা তো দেখাতে যেছ বারেবার, পারছ কি ?

পারছ নাই।

আরে, সব জমি বেরাবে।

কেমুনে ?

তুমি আমরাদের বিশ্বাস যাও ?

যাই। তুমরা সাচাই।

তবে বুঝি দেখ। আমরা লিস বানাব।

হিসাবটো ?

কানুনগো বাবুটো মোরাদের সমান ছেলা। সি বলছে, আপোনারা বলেন, কিছু বিপদ হবে নাই—আমি সরকারের রেকড হতে সব বাহার করে ফেলাব। সরকারের খাস জমি বেআইনে রাখে, তো সি জমি বাটি দিব। যিথা বর্গা রাখে, নামটো রেকড করি দিব।

বিপদের কথা বলল কেনি ?

বলবে নাই—দীনু সাগ্রহে বলল, উয়াদের বিপদ আছে। জমি যি জনা এতকাল রাখে বেঅইনা, সি ছাড়ি দিবে উয়ারে ? জোত-দার কারেও ডরে না। এতকাল ডরে নাই। ই বার বুঝবে, হাঁ ! কার সাথ লড়তেছি ?

জমি কে কতটা রাখতে পারে সেচ ও অ-সেচ এলাকায়, তা অনেকবার শুনেছে রতন কালী সাঁতরার কাছে। কালী সাঁতরা তার কাগজের কারণে বহু গ্রাম জরিপ করেছিল। রতন বলত, তুমার কামটো বালিচরে ধান বুনার সামিল। খুব তো খাট, কাম হয় না কিছু।

কালীবাবু তখন বলত, হবে, হবে।

আমি মরল্যে ?

আহা, তেভাগার গল্প শোনো।

বেত্তান্ত শুনে কি করব বাবু? মোরাদের পেটের যি এক ভাগ ভি পুরে না?

রতন হঠাৎ বলেছিল, সদর গ্রামে তুমারদের মতিবাবুর ভি অম্বুমার জমিন। পাঁচ ঘর কাওরা বর্গা করে। সি জমি ভি খাস হবে? তাতে বর্গা-রেকড হবে?

বিত্তহীন ছোট চাষীঘরের ছেলে গৌর ও কদম, বাবুদের বাগালের ছেলে দীনু, থমকে গিয়েছিল। তারপর দৃঢ় বিশ্বাসে বলেছিল, নিশ্চয় হবে। হতেই হবে।

ভালো, খুব ভালো।

জ্যেঠা! তুমারে সাথ সাথ রতে হবে।

কেনি?

দীনুরা বলেছিল, রতন না থাকলে বড় কাজটা করা যাবে না। কানুনগো অফিসার, অজয় মজুমদার বলেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। বর্গাদার জমিমালিক হবে, এ আইনটি অনেকদিনের। তবে কখনোই তেমন কড়া হাতে বলবৎ করা হয় নি। ১৯৭৬ সালে কোন কোন জায়গায় আইনমাফিক কাজ করার হুড়কো আসে। তখন দেখা গেছে কত অসুবিধে।

বর্গাদারই বলে, না, বর্গা করি না।

কেন বলে?

তাকে রক্ষা করতে আইন আছে, এ কথা বলে কোনো লাভ নেই। কেন না তাকে লড়তে হবে জমিমালিকের সঙ্গে। জমি-মালিক ইচ্ছে হলে হাইকোর্ট অবধি মামলা টানতে পারে। বর্গা-দারের সাধারণত মুনসেফ আদালত অবধি যাবার পয়সা জোটে না। অত্যন্ত বিরল কিছু ক্ষেত্রে কেমন করে যেন বেশ সম্পন্ন লোকও বর্গাদার হয়ে বসে আছে। তারা জানে, কোনো-না-কোনো দিন তারা জমির মালিক হবে। এ রকম কেস অবশ্য হাজার হাজার নেই।

বর্গাদার কি নিজের স্বার্থ বোঝে না? খুব বোঝে। বুঝেও বলে, না, বর্গা করি না।

কেন না, বর্গাদার জানে, সরকারি কানুনগো তার নাম লিখিয়ে দিয়ে, আইনমোতাবেক ভরসা দিয়ে সরে পড়বে। তখন জমি-মালিকের কোপে পড়বে সে। সারা জীবন যার কাছে খরায়-বানে-আকালে ধার নিতে হয়, তাকে চটাবে? বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি, বল ভাই ধন্য হরি।

ঠিক এই কারণেই, সরকারি জমির বেআইনি ভোগকর্তা হয় জোতদার। তার কবল থেকে সে জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনকে দিলে, পরিণামে ভূমিহীন লোকটি জোতদারের কোপে পড়বেই পড়বে।

আসলে এতকাল, কোনো ভূমিসংস্কার আইন কার্যকরী হয় নি, তার কারণ—

এগুলি বলবৎ করার দায় কানুনগোদের।

রাজনীতিক প্রতিপত্তিবলে জোতদাররা মন্ত্রী-হাকিম-থানাকে ব্যবহার করে। আইনকে কাঁচকলা দেখায়, কানুনগো জাতীয় তুচ্ছ অফিসারকে পরোয়া করে না।

এদের বিষয়ে, বর্গাদার ও খেতমজুরদের মনে ভয় একেবারে গভীরে বাসা বেঁধেছে। তাই তারাও এগিয়ে আসতে ভরসা পায় না। সরকারের আইন যে তাদের বাঁচাবে না তারা তা জানে। তাই তারা নীরব থাকে ও মার খায়।

এবার মনে হচ্ছে সরকার কিছু করতে চায়। ভালো কথা। অজয় মজুমদার ঘুষ খায় না। কাজ সে দেখাবে যদি সঙ্গে থাকে পার্টির ছেলেরা। আর সর্বাগ্রে দরকার, সরকার এবার আইন বলবৎ করবে, এ ভরসা লোকের মনে জাগানো। যাকে মানুষ বিশ্বাস করে, এমন কেউ যদি কথাটি বোঝায়, প্রাথমিক স্তরে কাজটি হল।

তারপর, সত্যিকারের ছুঁদে কোনো লোকের বেনাম জমি উদ্ধার করে যদি বেঁটে দেয়া যায়, যদি কয়েকটি বর্গাদারের নাম রেকর্ড করানো যায়, তা হলে কেল্লা ফতে। তখন দেখা যাবে মানুষ সরকারে আস্থা রাখছে। এগিয়ে এসে নাম রেকর্ড করাচ্ছে।

সব কথাই রতনকে বলল দীনুরা। অজয় মজুমদার কেন, ওর মতো অনেক ভালো সেটলমেণ্ট কানুনগো, ল অ্যাকুইজিশন কানুনগো, জুনিয়ার ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার বা জে এল আর ও বা জেলেয়ার বাবু—১৯৬৮ সালের পর থেকে যাদের চাকরির বিভিন্ন পর্যায়ে মিলেমিশে এক সার্ভিসে গণ্য হচ্ছে—তারা সবাই খুব খুশি হয়।

এবার মনে হচ্ছে কিছু একটা হবে।

এর আগে কোনো সরকারই যেন কাজটা করতে চায় নি।

এবার জোতদাররা শঙ্কিত।

এতদিনে পুরনো এক অবিচারের বিচার মিলবে।

এইসব কথা চলতে থাকে, চলতে থাকে। আর পুরনো দিনের যে-সব পার্টিকর্মী নয়া জমানায় অবসর পেয়েছে, সেই সব ভুলে যাওয়া মানুষ এতকাল পরে কোথা থেকে যে এসে হাজির হয়।

নগেন মাইতি, চল্লিশের দশকের পর যে গিয়েছিল কাকদ্বীপ আন্দোলনে, সে আসে। আসেন শশী বেরা। তিরিশের দশক থেকে যিনি কৃষক আন্দোলন করেছেন।

কি রতন, চিনতে পার?

ই কি শশীবাবু কুথা ছিলে গ?

মরে ছিলাম বলতে পার। সে কি হাঁপানি রে বাবু! তা খবর যা শুনলাম—ভাবলাম জাগুলা যাবার পথে যাই একবার চরসা। রতন থাকলে চিনবে। নগেনকেও ধরে আনলাম। একলা চলতে পারি না বাবু।

জাগুলা বা যেছ কেনি?

ডুনো জনের এক জ্বালা যে!—হাঁ করে খানিক শ্বাস নিয়ে শশীবাবু বলল, আমার নাতি, ওর ছেলে, সব বর্গা করে না? নামটা রেকড হবে শুনছি। তাতে বলি, যেয়ে জেনে আসি। হলে পরে এক রকম নিশ্চিন্ত। তিন-চার মাসের ধানটা আসবে। বাকি ক-মাস? যেমন জুটবে—

রতনের বুকে তোলপাড় করেছিল পুরনো কথা যত। এ-সব লোক এক সময়ে কিষাণ সভার স্তম্ভ ছিল একেকটা। পার্টির নাম সকলে ভাঙায় না। এরা ভাঙায় নি। আজ হকীয়তী পাওনাটুকুর জন্যে চলেছে জাগুলা।

রতন বলেছিল, ডমের ভাত বহুত পেটে আছে তুমারদের। আজ ভি থাক। কাল হাটুরা গাড়ি ধরা দিব, চাপি চলি যাবে। রাতখানিক থাক।

ভাত, খেসারি ডালের চচ্চড়ি, লঙ্কা ভাজা। ভাত খেয়ে শশীবাবু অনেককাল বাদে, যেন বর্গা রেকডের সম্ভাবনায় চিন্তামুক্ত হয়ে তেভাগার গল্প করেছিল। বলেছিল, এ-সব কথা এখন কেউ বলে না হে। আর বর্গা দাবিতে জমিমালিক হাললাঙল, বলদ, সার, বীজ দিলে আধাআধি, না দিলে বারো আনা-চার আনা, সে কথাও টিকে না। দেয় না কিছুই, নেয় আধা ফসল। তাই তিন ভাগে তেভাগা কোথা? আধা ভাগ, দোভাগা এখন। তবু তাই হোক। তাই দেখে যাই।

রতন বলেছিল, তোমরা যা বলেছ তখন, আর বসাই বলেছে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা। এ-সব এখন জানে কে? জাগুলা গিয়ে যাত্রা দেখে এসে ছেলেরা বলে, জান রতন কাকা! সাঁওতালরা সাহেবদের সঙ্গে লড়েছিল।

এ ভাবেই কথাগুলি ছড়াচ্ছিল। বাবু গ! সব সময়ে আমরা পেটের ভাতটা, মাথার তেলটা, পরনের তেনাটা এ সব চিন্তায় থাকি। কিন্তু বর্গা রেকডের রমরমাতে সে-সব চিন্তার ছাই উড়ে

গিয়েছিল কোথায়। তখন আমরা নিজেরা, নিজেদের যে মর্যাদা আছে, তা আবার ভেবেছি। এই আত্মমর্যাদা জাগাবার চেষ্টা তো সাচাই কর্মীরা সবাই করেছে। তখন সে মর্যাদা মনে রাখার জন্যে চেনা-জানা লড়াইগুলির কথা আবার বলাবলি করেছি। বসাই লড়েছিল খেতমজুরের ওপর অবিচারের শোধ নিতে। সে বলেছিল, বর্গাদারী লড়াই তেভাগাতেও খেতমজুর রক্ত দিয়েছে। আমরা ভেবেছি, আজ যদি বর্গাদার সুবিচার পায়, কাল খেতমজুর পাবে।

এই বিশ্বাসেই রতন এগিয়েছিল। দিলীপ সোরেন আর উদ্ধব কাওরাকে জিগ্যেস করেছিল। তারা বলেছিল, দীনু, কদম, গৌর, রজত, সবাই অত্যন্ত খাঁটি ছেলে। এরা তোমার কাছে যা বলছে, তা যদি হয়, তা হলে খুব ভালো। আমরা তোমাকে সাহায্য করব।

তারা সাহায্য করেছিল। দিলীপ তার সাইকেলে রতনকে নিয়ে কত ঘুরেছিল। রতনকে নিয়েগেছে দিলীপ, আর দীনুরা ঘুরেছে সঙ্গে।

ইন্দ্রবাবু! এটা কি তুমি খেয়াল করে শুনলে? দিলীপ সোরেন আর উদ্ধব কাওরা তোমাদের গ্রাম পর্যায়ের কিষাণকর্মীদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে বর্গাদারদের মনে ভরসা দিয়েছে। সামন্তবাবুরা সাহায্যের হাত ঠেলে ফেলে দেয় প্রথমে। তারপর 'নকশাল' বলে ছাপ মেরে রাখে নামে। লক্ষ্য করলে?

চরসায় রোতোনি সাউ খেতমজুরে চাষ করায়, আমরাও করি। কি পাই, তা জানতে চেও না। কিন্তু ভূষণ হাঁসদা, চিকু হাঁসদা, ব্রজ কাওরা, উৎসব কাওরা বর্গা করে। তাদের বাপরা করেছে, তারাও করে। জমি? চার বর্গাদার, জমি তিন লপ্তে, পরিমাণ বারো বিঘা তিন ছটাক সাত আঙুল। লেখাপড়া জিনিস, এতে ভুল হয় না আর।

রোতোনি এখন মস্ত জমিমালিক। বাকুলির জোতদার সূর্য সাউ তার দাদা। সূর্য সাউকে তো বসাইরা কেটে ফেলে সে সময়ে।

সূর্যের বউ, ছেলেরা, সবাই এখন সদর শহরে। 'সূর্য বাস সার্ভিসে' তিনটে বাস চলে, পেট্রল পাম্প আছে, তারা জোতজমার আয় নেয়, দেখাইভালাই করে না। ফলে রোতোনিই সর্বেসর্বা।

অজয় মজুমদার, চরসার এই জমিটি বর্গা রেকর্ড করার তোড়জোড় করে। সে বলেছিল, রোতোনি যেহেতু মস্ত জোতদার—সেহেতু তার জমিতে ভাগচাসী রেকর্ড হলে মানুষের মনে তা প্রেরণার কাজ করবে। অজয় নিজেও দীনুদের পার্টি সমর্থক। সে আরো বলে, চরসা গ্রামটি নিয়ে বহু কথা হয়েছে। সেখানে অধিবাসীরা মনে করে পার্টির চোখে তারা এখনো বিশ্বাসের অযোগ্য।

এমন এক পরিবেশ ভালো নয়। চরসায় তাই, ওই সামান্য জমিতেই এদের নাম রেকর্ড হলে, চরসার মানুষের মনেও আস্থা ফিরবে প্রশাসন বিষয়ে। খুব গরিব, খুব অবহেলিত গ্রাম। এ রেজিমে চরসাবাসীর বিবিধ সমস্যার কোনো সমাধানের চেষ্টা করা হয় নি। কেবল নতুন পুলিশ থানার আওতায় আনা হয়েছে গ্রামটিকে।

রতন বলে, তাই হোক। তাই কর বাবু, চক্ষে দেখি। সানথাল আর কাওরা যখুন জানি যাবে জমিটোতে তাহার হক আছে, তখুন ছাতিটো বড় হই যাবে তাহার। ই কামটো কর বাবু, উরাদের চিতানো ছাতিটো চক্ষে দেখি।

এবং এই জমি বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে চালাতে অজয় মজুমদার এক আশ্চর্য সত্যের সম্মুখীন হয়।

সে যখন অনুসন্ধান চালাচ্ছে, তখন রোতোনির গোমস্তা ভূষণ, চিকু, ব্রজ ও উৎসবকে জনে জনে শাসিয়ে যায়, বর্গা করিস তুরা? রেকড আছে তুরাদের?

বাবু রসিদ দিছে নাই?

রসিদ দিছে না কি?

হেই কি বল? তুমি তো দিছ রসিদ! তুমার কাছারি বসাও

যখুন, তখুন ধান মাপি লও, রসিদ দাও।

উ রসিদ লয়ে কোটকাছারি করি দখল লিবি ?

সরকার দখল দিবে।

তুরা বুঝিস নাই কিছু। চাষ উঠালে দখল আসে ? কবে থেকে আর বাবুরা বছর বছরকে ত্যাত বর্গাচাষী উচ্ছেদ করত না। কারে নাই উচ্ছেদ ? তখুন কুন সরকার আসি বাঁচায়েছে তারাদের ? তারা এখুন মজুর খাটে না ?

গোমস্তা চলে যায়। যাবার আগে বলে যায়, সাউবাবু মালিক ? সি জনা দেবতা। ধান বাড়ি দেয়, টাকা করজ দেয়, কুন মালিকটা আছে এমন ? আমি তুরাদের ভালো কথা বলি। জমিমালিকের সাথ বিবাদ উঠায়ে কুনো জন পার পায় না। কথাটা চিন্তে দেখিস।

ভূষণরা তখনি আসে রতনের কাছে। রতন গম্ভীর হয়ে যায়। হ্যাঁ, গোমস্তার কথাটিতে আছে এক তিক্ত সত্য। ভূমিসংস্কার আইনের বয়স অনেক। আইন তেমনভাবে কোনোদিন বলবৎ করাও হয় নি। কিন্তু পাছে বলবৎ করা হয়, পাছে ভাগচাষী জমিতে দাবি জানায়, সে ভয় মালিকদের ছিল। চরসার মাটি তো উর্বরা। সূর্য সাউ তাই চরসার জোত থেকে তার ভাগচাষীদের ক্রমে ক্রমে উচ্ছেদ করেছে বহু বছরে। এর চেয়ে চাষের সময়ে লোক লাগানো অনেক বুদ্ধির কাজ।

বাকুলিতে তার ঘাঁটি। সেখানেও মাহিন্দার ভাতুয়া, খেতমজুর বেশি। চরসা অনেক দূরে। একদিনের ভাগচাষীরাই আজ তার জোত ফুরনে, অথবা দিনমজুরিতে চষে মজুর হয়ে। ভূষণদের সামান্য জমিটুকু থেকে ওরা উচ্ছেদ হত সূর্য বেঁচে থাকলে। সূর্য মরে গেল। রোতোনি আর এ গোলমেলে জায়গাকে ঘাঁটায় নি।

রতন, রজতকে ভূষণদের রসিদগুলি দেখাল। দেখে রজতের মুখ থমথমে হয়ে উঠেছিল।

এই রসিদ ?

এই। কেনি রজত ? মুখ কালা করলে কেনি ?

রতন কাকা!

রজতের মুখ যেন ভেঙেচুরে যাচ্ছিল, রতন কাকা! ই জমিনে বর্গা না বসাই যদি তো আমি বাপের ছেলা লই। লামটো পালটি লিব আর দেশ ছাড়ি চলি যাব। ইয়ার দাদারে কাটছে, ইয়ারে কেও কাটলে তার দোষ লাই হে। বর্গা ঠকাতে রোতোনি সাউ চোথা কাগজে রসিদ দিছে, লিখে দিছে, ধান বাড়ি নছিল, করজটোর শোধ এত পেছি।

স—ব মিছা ?

ইয়ার দাম আদালতে নাই যদি তো আমারদের দিতে হব জবাবটো। আমি যাব কানুনগোর ঠাঁই। গ্রাম সাক্ষী ভি সাক্ষী। আজ কিষাণসভার কর্মী যখন বলবে, হাঁ য়ারা সাচাই বর্গা করে। সি কথা মানি নিবে আদালত।

দিলীপ সোরেন বলেছিল, ভুল বুঝ না ভাই। রোতোনির খুঁটির জোর কতখানি, জেনে আগালে হত ?

খুঁটির জোর ? কুথায় ?

অঞ্চল প্রশাসনে।

কিছু লাই। উলটা প্রচার দিও না সোরেন। ই কুন সরকার ? ই সরকার জোতদাররে মদত দেয় না।

দেখ।

হাঁ হাঁ, দেখব আর দেখায়ে ভি দিব!

রজতরা আগে যায় অজয়ের কাছে। সেটলমেণ্ট আপিসে। অজয় যা বলে, তাতে তাদের বুক দশহাত হয়।

অজয় তখন আশ্চর্য এক আবিষ্কারের আগুনে জ্বলছে। সে বলে, বর্গা রেকর্ড ? ঠিকমত খেলাতে পারলে, এই ম্যাপটা দেখুন। এই সমস্তটা জায়গায় এদের জমিমালিক করে দেওয়া যাবে।

অন্তত-চোদ্দ পনেরোটা পরিবার জমি পাবে।

সে কি ?

এই সমস্ত ভূখণ্ডটি পয়স্তি জমি। পুরনো জরিপি ম্যাপ দেখে হদিশ পেলাম। এ জায়গাটা ওর ছিল না। চরসার নদী সরে যাওয়ার ফলে এই জমি বেরোয়। নদী বা সমুদ্র সরে গেলে যে পয়স্তি জমি বেরোয়, তা সরকারের, খাস জমি। খাস পয়স্তি বেআইনী দখলে রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ। এবং খাস জমিতে প্রজা বিলি হতে পারে। এর মধ্যে ওই চারজনের জমিও পড়ছে।

তা হলে ?

জরিপ হবে, সে কাজ আগে।

রতন বলে, জরিপ করতে দিবে না।

না, জরিপ বাধা আসে না। অন্য কোথাও কলকাঠি নাড়তে থাকে রোতোনি সাউ। বড় জোতদার সে, শহরে তার তিনটে উকিল থাকে খাতিরের। কলকাতায় উকিল হাইকোর্টে কেস করে। কৌশলী রোতোনি কেসের ধার কাছ দিয়ে যায় না।

গভীর মনোদুঃখে সে যায় মতিবাবুর কাছে। সামন্ত নেই, নবীনবাবু ও মতিবাবু আছে। কথা বলে কান্না চেপে চেপে, বড় বড় নিশ্বাস টেনে। ধর্মরাজ্যে বাস করছে রোতোনি। পার্টি তহবিলে বানের সময়ে ঢেলে টাকা দিয়েছে। বাসগুলো দিয়েছিল দুর্গতদের নিরাপদ জায়গায় আনার জন্যে। এ তো সে নিঃস্বার্থে করেছে। ধর্মরাজ্যে বাস করলে এ-সব করবে না ?

কিন্তু সে তো কিছু পেতে পারে প্রতিদানে ? দাদার মৃত্যুর শোক পাঁচ বছরেও ভোলে নি সে। তাই জোতজমার ব্যাপার বুঝে ওঠা হয়নি। জমির ব্যাপার ও বোঝেও না। কিন্তু এটা তো জানে যে চরসায় ওর কোনো বর্গাদার নেই। জমির উর্ধ্বসীমা ? পরিষ্কারে নামে নামে আছে। পার্টির ছেলেরা কেন তার পেছনে লেগেছে ?

না না, পার্টির ছেলেরা খুবই ভালো। কিন্তু নকশালী দিলীপ সোরেন, উদ্ধব কাওরা আর রতন ডোমের খোঁচানিতে উশকানি খেয়ে তারা যে রোতোনির জমিজমার ভূয়া বর্গাদার রেকর্ড করাচ্ছে, তার কি উপায় ? রোতোনি খানিকটা বাড়তি জমি তো রেখেইছে। সেটা সে ঝপ করে ভেস্ট করিয়ে দিয়ে তার বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করাতে চায়। বললে 'খানিকটা'—কিন্তু জমিটি আয়তনে কম নয়। তা শ খানেক বিঘা তো হবেই। খোদ বাবুলিতে এই ভূখণ্ড।

অজয়ের আবিষ্কারের সময়েই রোতোনির ছুটাছুটি চলে। একই সঙ্গে রজতরা জমি-মালিকদের নামের তালিকা বানাতে থাকে। সেই সময়েই সামন্ত, দারুণ এক কাণ্ড করে ফেলে। শহরের ঝানু উকিলদের নিয়ে এক প্যানেল গঠিত হয়। অপারেশন বর্গা সংক্রান্ত সব আইনী তদারকি এঁরা করবেন। সুকুল সাঁতরাকে বলে, আপনি প্যানেলের প্রধান। আপনি যেখানে আছেন, গরিব বর্গাদার সুবিচার পাবে।

অজয়ের মাপজোখে চরসার পয়স্তি পঁচাত্তর বিঘা, তেরো কাঠা তিন পোয়া তিন ছটাক সতেরো হাত জমি বেরিয়ে আসে। ম্যাপের ওপর। এই সব জমিতেই রজতরা পার্টির ঝাণ্ডা পুঁতে দেয় এবং সাঁওতালপাড়া থেকে মেয়েপুরুষ, ডোম, কাওরা, সবাই চলে আসে মহানন্দে এ অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখতে। রজত, দীনু, গৌর ও কদমের মুখের উল্লাসের ছবি দেখার মতো হয়। রজত বলে, এ-সব জমি তোমরা পাবে।

এই সময়েই রোতোনির আর্জিতে পুলিশ এসে পড়ে। ঝাণ্ডাতে হাত দেয় না পুলিশ, কিন্তু থানায় গিয়ে জানা যায় এখন এ জমি নিয়ে কিছু করা চলবে না।

কেন ?

ফচকে চেহারার দারোগা গভীর অবিশ্বাসে সাঁওতালদের কালো কালো ঘাম চিকচিকে মুখের দিকে চায় এবং মুখস্থ পড়ার পরীক্ষা

দেয়ার ভঙ্গিতে সরুগলায় চেঁচিয়ে বলে, জমিতে গণ্ডগোল আছে। তোমরা যে যার ঘরে চলে যাও হে।

পুলিশকে ধমকায় কদম, এবং দারোগা একই গলায় বলে, আপনারা আমাকে তাসাবেন না। আমি ডিউটি করছি বই তো নয়।

ঘটনাটি পার্টি পর্যায়ে মতিবাবুকে জানাতে গিয়ে তখন ওরা দেখে, তালিকা থেকে রামেশ্বর ভূঞা আর রোতোনি সাউয়ের নাম সরে গেছে। 'মুলতুবি' তালিকায় চলে গেছে।

এর মানে কি মতিদা?

কিসের মানে?

তল্লাটের সবচেয়ে বেশি জমি যাদের তাদের নাম সরালেন কেন?

বর্গা রেকর্ড হবে না?

হবে হবে।

পুলিশ গিয়েছিল কেন?

জমিতে ঝাণ্ডা বা পুঁতলে কেন?

বেআইনী জমি।

আদালত সেটা দেখবে।

আপনারা নেতৃত্ব পর্যায়ে কি করছেন এ-সব? ওদের আশকারা দিচ্ছেন কেন?

আশকারা দিচ্ছি?

এর মানে তো তাই দাঁড়ায়।

দাঁড়াও কদম, দাঁড়াও। নকশাল আমল নয় এটা। আইন হাতে নিয়ে হঠকারিতা করলে চলবে না।

কাজের কাজ করতে বললেই বলবেন, নকশালী হঠকারিতা করছি। না, নকশালী হঠকারিতা করছি না। পার্টির ছেলে হিসেবে জনতার কাছে আমাদের দায়িত্ব নেই? কাজ দিয়ে সে দায়িত্বের

প্রমাণ রাখতে হবে না ?

যাও, রোতোনির কাছে যাও। কথাবার্তা বলে দেখ।

সে আসুক। আমরা যাব না।

সে কি বলছে জান ? বর্গাদার আদালতে প্রমাণ করুক সে বর্গাদার। আমিও আদালতে প্রমাণ করব ও জমিতে আমার ভোগ-দখলী অধিকার আছে।

কানুনগো আপিসের কোনো কথাই রোতোনি মানে নি। আর তখনি ওরা যায় সুকুল সাঁতরার কাছে। আইনী সাহায্য কমিটির কাজটি সুকুলবাবু খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছিলেন। তিনি সব মন দিয়ে শোনেন ও বলেন, এ কেসটা গুছিয়ে সাজাতে হবে। এরা যে প্রকৃত বর্গাদার তা সাক্ষীসবুদে দাঁড় করাতে হবে, রসিদ তো ভূয়া। বেনাম জমি ভোগদখল করে জোতমালিক। সে জমি খাস করে নেবার সময়ে সরকার জোতমালিককেই ক্ষতিপূরণ দেয় কেন ? অন্যায় করবে ক্ষতিপূরণও নেবে ? পয়স্তি জমির ব্যাপারটা আলাদা কেস হবে।

ডিক্রি পাব ? ইজ্জতের লড়াই।

নিশ্চয় পাবে।

কেসের তোড়জোড় চলতে থাকে, চলতে থাকে। তারপর একদিন জানা যায় সুকুলবাবু সামন্ত ও মতিবাবুকে গালিগালাজ করে কমিটি ছেড়ে দিয়েছেন।

কেন না রোতোনি সাউ তার নিজের জমি ভেস্ট করিয়েছে, ক্ষতিপূরণ বের করে দিয়েছে চার লাখ টাকা, আব নিজের মাহিন্দার চাকরদের নাম বর্গা রেকর্ড করিয়েছে। শহরে সবাই চমকে গেছে। জমি রইল, কেন না বর্গাদারগুলি ভূয়া, তারই অন্নদাস, ক্ষতিপূরণের টাকাও এল।

মতিবাবুরা ঘটনাটিকে 'অপারেশন বর্গা কার্যসূচীর রূপায়ণের পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ' বলছে।

অজয় বদলি হয়ে যায়। পয়স্তি জমি রোতোনির দখলে থাকে। ভূষণ হাঁসদা, চিকু হাঁসদা, ব্রজ কাওরা ও উৎসব কাওরা বর্গা অধিকারে উচ্ছেদ হয় এবং খেতমজুরে পরিণত হয়।

রতনের কাছে রজতরা ক্ষমা চেয়েছিল। পার্টির গণভিত্তিক ক্যাডার সাচ্চা হলে পার্টির জন্যে জান দিতে পারে। নেতৃত্ব পর্যায়ে দুমুখো নীতির সঙ্গে লড়তে পারে না।

রতন মাপ চেয়েছিল ভূষণদের কাছে।

শশী বেরা বলেছিল, পার্টি নেতৃত্বের এই অসততার ফলে পার্টি চোট খাবে। ক্যাডারের মনোবল ভেঙে যাবে।

ইন্দ্রবাবু! রতন তো তোমাকে সব কথাই বলল। এখন বল, কি করে তুমি কাজ করবে? কাজ তোমায় করতে দেবে না। অপারেশন বর্গায় হয়তো কিছু সাচাই লোক নাম রেকর্ড করিয়েছে। কিন্তু রোতোনি ও রামেশ্বর, পার্টির দুই মদতদার পিছলে বেরিয়ে গেছে। তাদের জমিতে বর্গা রেকর্ড হয় নি।

এ সকল কার বেবস্থা?

শুনতে শুনতে ইন্দ্র তখনি মন স্থির করে। বলে, তুমি শুয়ে পড় রতনদা, আমিও শুই।

কি বুঝলে? বুঝ কিছু?

অনেক কথা স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমে ক্রমে।

ই কানুনগোটো চেচায় বিস্তর, কিন্তুক ছেলা সাচাই।

রতন বলে, দীনও বলে ইন্দ্রকে, খবর যা আছে কানুনগোর কাছে। কিন্তু কোনো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার পর কানুনগো অফিসাররাও ঘাবড়ে যায়। কাজ করতে যায় তারা, তাদের ওপর হামলা হলেও বাঁচাতে নেই কেউ। জেলা হাকিম, থানা, আইন-মাফিক এদের মদত পাবার কথা। কেন যেন হয়ে ওঠে না তা।

নতুন কানুনগো তুষার পাত্র বলল, খুব মুশকিল, জানেন? সব করতে পারি, কিন্তু কোথায় আছে একটা কাচের দেয়াল। সেট

ভাঙতে পারি না। তাই মনে হয়—

কি ?

অপারেশন বর্গা সফল হোক, এ কি কেউ চায় ? চায় যদি, বাধাগুলিকে শক্ত হাতে সরানো হচ্ছে না কেন ?

তুষার পাত্র বলল, শুনে যান। তা হলে বুঝবেন। শুনছেন যখন, তখন মনে করতে পারেন গল্প শুনছেন।

একটা কথা। অপারেশন বর্গার কিছু হবে না জেনে কাজ করতে যান যদি, কাজ করবেন কি করে ?

সরকারি উপদেশ কপচাবেন না কি ?

আছে তেমন উপদেশ ?

নিশ্চয়। মনে থাকা চাই আদর্শবাদ, সত্যনিষ্ঠা, দুর্জয় সাহস—কানুনগো কি অরণ্যদেব নাকি ? 'ক' বাবু সরকারি জমি নিজে হাপিস করে সাঁওতাল বর্গা লাগিয়ে রেখেছে। কানুনগো সে সাঁওতালদের বর্গা রেকর্ড নয়, জমিমালিক করে দিতে গেল। পার্টি লাইনে পড়ছে ?

খুব পড়ছে।

পার্টির লোকজনও জানল। তারপর জমি দখল দিতে গেলে, ছেলেরা 'ক' বাবুর লোকজনের সঙ্গে এক হয়ে কানুনগোকে পেটাল—যদি বলি এটা গল্প নয় ? কানুনগো সরকারি কর্মচারী হয়েও পুলিশের সাহায্য পেল না, এস ডি ও তার আর্জি চেপে দিল, যদি বলি এটাও গল্প নয় ?

কোথায় হয়েছে বলুন।

ধীরে, ইন্দ্রবাবু, ধীরে। মাঠ-বন-জঙ্গল-নদীর চর ভেঙে ঘুরব এ কাজে, চাকরি করতে এসে বেশি ফড়ফড়িয়ে নিজেকে বিপন্ন করব কেন ? আপনি আমাকে বাঁচাবেন ?

স—ব এই অভিজ্ঞতা ?

তা কেন ? ছোট, মাঝারি, বেজুতে পার্টি পেলে বর্গা রেকর্ড

হচ্ছে। কিন্তু ছোট লপ্তে অনেক বর্গা বসালে না ভাগচাষীর লাভ, না জোতদারের। তেমন ভাগচাষী খেতমজুর হয়ে যেতে বাধ্য।

কি জটিলতা !

জোতদার জমি ভেস্ট করতে দিল, ক্ষতিপূরণ নিল, ভূয়া বর্গা রেকর্ড করাল। ফলে অপারেশন বর্গা খাতায় ঠিকই হল। আসলে জোতদার জমি রাখল। টাকা নিল, বর্গাদারদের—মানে সাচ্চা বর্গাদারদের বঞ্চিত করল। কেমন লাগছে ?

চমৎকার !

ঠিক জায়গায় কলকাঠি নেড়েছে বলে 'ক' বাবুর বেনাম জমিতে হাত পড়ল না, বর্গা রেকর্ড হল না। কলকাঠি হাতে পায় নি 'খ' বাবুর জমি ভেস্ট হয়ে বর্গা বসল।

কত রকম ঘটনা বললেন !

জোতদারের ভয় এমন বাঘা ভয় যে কানুনগো জানে 'গ' বাবু বর্গা রাখে—তবু বর্গা আনতে পারল না সেটলমেণ্ট ক্যাম্পে। অগত্যা সরজমিনে হাজির হল, বর্গাদারদের বোঝাল অনেক। তারপরেও জোতদারের হুমকিতে বর্গাদার সব পালাল। কানুনগো বোকা বনে ফিরে এল। দৃশ্যটা মনে করুন, কানুনগোটি হেঁটে চলেছে, বর্গাদাররা উধাও।

এই ভয়টা ভাঙতেই হবে।

কে ভাঙবে, আমি ? আমার হাতের মাসল্‌টা দেখেছেন ? পেনসিলের মতো। ভয় ভাঙব কি করে, আমি নিজেই যে ভীতু মানুষ ! ভূতের ভয়, সাপের ভয়, ওপরঅলার ভয়, প্রকাশক পার্টির ভয়, গিন্নির ভয়—ক্যানসারের ভয়, এনকেফেলাইটিসের ভয়—হাসবেন না। একেকজন কানুনগো অফিসারের পক্ষে নিজস্ব ভয়-ভীতির, বিশ্বাসের সীমাবদ্ধতা নিয়ে বর্গাদারের মন থেকে জোতদার বিষয়ে ভয় দূর করা সম্ভব কি ?

বলে যান।

চেষ্টা করে ধরুন 'অ' বাবু, চেষ্টা করে 'অ' থেকে 'ঔ' পর্যন্ত ধরুন সবাই। এরা চেষ্টা করল। প্রাণপণ চেষ্টাতেও 'চ' থেকে 'হ'-কে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ ও নিঃশঙ্ক করতে পারল না। 'অ' থেকে 'ঔ' যখন 'চ' থেকে 'হ'-কে উদ্বুদ্ধ করে, তখন কিন্তু 'ভুলে যেও না একদিন তুমি তেভাগা করেছিলে' বলে না। আইনের ব্যাপারটি বার বার বোঝায়। তারপরেও 'চ' থেকে 'হ'-কে যথেষ্ট ভরসা জোগাতে পারে না। কেন?

বুঝতে পারছি।

'ক' থেকে 'ঙ' অর্থাৎ জমিমালিক, দূর-দূর গ্রামে সত্যিই এত শক্তিশালী যে 'চ' থেকে 'হ' মনে মনে ভাবে, 'অ' থেকে 'ঔ' বাবুরা তো চলে যাবে সরকারি কাজ সেরে। তারপর? বাবুদের কোপ থেকে আমাদের কে বাঁচাবে?

আরো আছে?

আছে, আছে, বহু আছে। কত বলব? সব আর নাই বললাম। সব শেষে আসছে কয়েকজন বর্গাদারের কথা। এ অতীব বিচিত্র ব্যাপার, কিন্তু রিপোর্টে এর সমর্থন থাকা উচিত, থাকবে কি না জানি না।

কি?

কয়েকটি ক্ষেত্রে বর্গাদারই প্রতিপত্তিশালী অর্থাৎ তার নিজেরও হয়তো জমি আছে, কারবার আছে, চোখে কালো চশমা এবং গায়ে টেরিলিন পাঞ্জাবির খবরও মিলেছে কয়েকটি—অথচ যে-ভাবেই হোক এরাও বর্গাদার হিসেবে নাম রেকর্ড করিয়েছে বহু জমিতে। একজন লোক তা দশজনের বর্গাদারী জমি বর্গাদারী অধিকারে আবাদ করবে না। এরা সে কাজ করাচ্ছে মজুর বা মাহিন্দার রেখে।

কি করে তা হতে পারে?

সেই তো প্রশ্ন।

কি করে এর মূলোচ্ছেদ হবে ?

আমার ধারণা, যখন কার্যক্রম নেওয়া হয়, তখন আন্তরিকতা ছিল। কিন্তু আমাদের দেশের ভূমিব্যবস্থায় বর্গাদারী রেকর্ড করানো মানে শেষ অবধি কি দাঁড়াবে, তা বোঝা যায় নি।

তুষার বাবু, যথেষ্ট খোলাখুলি কথা এতক্ষণ বলেছেন। এখন হঠাৎ লজ্জা লজ্জা ভাব করছেন কেন ?

না। লজ্জা কিসের ?

ভয় পাচ্ছেন ?

ভয় ? আপনাকে ? কেন, আপনাকে ভয় পাব কেন ? আপনারা তো আমার শ্বশুরকুলের সূত্রে কুটুম। এ রকম কুটুমের সংজ্ঞা আমার জানা নেই। সম্ভবত পার্টিতুতো কুটুম।

দীনু বলেছিল, নগেন মাইতির ভায়ের বিটি ইনার পরিবার গো ইন্দ্রদা।

বুঝলাম।

তুষার বলেছিল, আমাদের দেশে এ পর্যন্ত বহু ভূমিসংস্কার আইন হয়েছে, জমিমালিকদের স্বার্থ চোট খায় নি। 'অপারেশন বর্গা' কার্যকরী হতে পারে, যদি সত্যিই বেনাম জমি বের করা যায়, অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দৃঢ়তায় কে প্রকৃত বর্গাদার, তার নাম রেকর্ড করা যায়, বে-আইনী খাস জমি দখলী খালাস করে ভূমিহীনের মধ্যে বিলি করা যায়। এ রকম জেলাওয়ারি দশটা করে করলেও লোকের মনে বিশ্বাস আসবে, সহযোগিতা পাবেন। বেশি নয়, সব চেয়ে বড় বড় দশজনের জমির বেলা যদি এমন করা যায়, সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে, বর্তমান কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখেই—বুঝেছেন ?

বুঝব না কেন ?

'অপারেশন বর্গা' এ ভাবে বলবৎ করলেও কিছু বৃহৎ জমি-মালিকের স্বার্থ চোট খায় না। লভ্যাংশ কমে। কিন্তু ভূমিহীন বর্গাদার জমিতে স্বত্ব পাবে, এ কথা বাতাসে টের পেতেই জমি

হস্তান্তরিত হচ্ছে। জমি দেখভালের চেয়ে বাস, কেরোসিনের ডিপো এবং পেট্রল পাম্পের মালিক হওয়া অনেক লাভজনক। আর কি জানেন ? যারা জমি রাখছে, তারা আগে যেমন রেখেছে আজও রাখছে বেনাম জমি। আজও ভোগ করছে খাস জমি। এদের স্বার্থে কোনোদিন চোট পড়বে না। তা হলে বলুন, 'অপারেশন বর্গাদার' বিজ্ঞাপন বা প্রচার যতটা, কার্যকালে ততখানি কি না, এ প্রশ্ন মনে ওঠে। তখন মনে হয়, মানে আমরা তো দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাচক্রের নিন্দিত সদস্য, সব রেজিমে গা বাঁচিয়ে চলাই আমাদের কাজ। কেন জানেন ? কেন বলুন তো ?

বাঃ, আমি তো শ্রোতা।

কেন না আমাদেরও ধারণা জন্মে যায় কার্যকলাপ দেখে, আইন করা হয়েছে, আমাদের বলা হয়েছে আইনমোতাবেক কাজ করতে, কিন্তু তা করি সে কারো ইচ্ছে নয়।

কারো ইচ্ছে নয় ?

না মশাই। পঞ্চাশ সালে আইনমোতাবেক কাজ করতে গিয়ে পি ডবলিউ ইনস্পেক্টর সুমোহন পাত্র—এই অধীনের বাপ—চাকরি খোয়াতে বসেছিলেন। আর এই সেদিন আমার ভাইবেরাদর অজয় মজুমদার আইন দেখাতে গিয়ে কান মলে বদলি হয়েছে।

কি দাঁড়াল তুষারবাবু ?

যোগফল।

যোগফল ?

বড় জোতদার, বড় চাষী, কার গায়ে কতটা চোট লেগেছে, লাগবে এ বর্গা অভিযানে ? কাদের নাম রেকর্ড হবে, কাদের নাম রেকর্ড হবে না ? ঠাকুর-দেবতা, মৃত প্রপিতামহ, গরু, ছাগল, কুকুর-বেড়ালের নামে বেনাম জমি রেখে ঊর্ধ্বসীমার বাইরে জমি রাখার ব্যাপার চলতেই থাকবে কতদিন ?

বর্গার পর কত সাহায্যের ব্যবস্থা হচ্ছে ?

ব্যাঙ্ক থেকে ঋণদান, ব্লক আপিস থেকে বীজ-সার দান তো ? স—ব আমরা জাতীয় চরিত্রগুণে গুবলেট করে দেব। ঋণ নেব শোধ দেব না, ঋণের ব্যাপারে তেল ঢালব তেলা মাথায়—রুখু মাথা শুকনো রেখে দেব। আর বীজ-সারের বেলা প্রথম পর্যায়ে বরাদ্দ মাপের ঠেঙে কম দেব, দ্বিতীয় পর্যায়ে লোকটার মাথায় হাত বুলিয়ে কম দাম দিয়ে নগদ টাকায় কিনে নেব বীজ-সার ? হে ভারত, ভুলিও না চুরি-জোচ্চোরি বাটপাড়ি মস্তানি গরিবকে ঠকানো তোমার মহান ঐতিহ্য—নিন, চা খান। চা এসেছে। গান শুনবেন, গান ? আমার ব্যাটারি সেট রেকর্ডপ্লেয়ার আছে।

গান শুনব ?

কেন, গান কি দোষ করল ? ডিটেকটিভ বই আর হিন্দী ফিলমি গানা আমি সর্বদা সঙ্গে রাখি। খারাপ বাংলায় মেরে দেওয়া রহস্য গল্প পড়ার চেয়ে মূল ইংরিজি পড়া ভালো। আর হিন্দী ফিলমি গানা হল গণসংগীত। সব চেয়ে বেশি লোক শোনে, হিসেব নেবেন। নাক কোঁচকাচ্ছেন কেন ? অপসংস্কৃতির গন্ধ পেলেন ? চানাচুর খান।

অপসংস্কৃতির নয় ?

না না, এও আপনার বোঝার ভুল। আমিও তাই ভাবতাম মশাই। আপনাদের এক যুবক নেতা সাত্যকি মিত্রকে খুব শ্রদ্ধা করতাম। অপসংস্কৃতি বিষয়ে সে অনেক বুঝিয়েছিল, আমিও বুঝেছিলাম। তারপর একদিন জানলাম, 'শোলে' ছবির সে এক বিশাল পৃষ্ঠপোষক। প্রায়ই দেখে। জিগ্যেস করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে আমজাদ খানের মতো হেসে উঠল, আমি কেটে পড়লাম। 'শোলে' ছবি একুশবার দেখে সেযদি অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বলতে পারে—আমি কেন ফিলমি গানা শুনব না ? উঠে পড়ছেন ?

আপনি যা বকতে পারেন, মাথা ধরে যায়।

ম্রিয়মাণ হয়ে গেল তুষার পাত্র। বলতে লাগল, বেজায় বকি,

তাই না? স্বভাবে সাম্যজ্ঞান নেই যে। কচুঘেঁচু খেয়ে থাকি—বাড়ি গেলে গপগপ করে তিনদিনে একমাসের খাবার খাই, অসুখে পড়ি। লোক পাই না, পেলেই এত বকি, যে ভয় খাইয়ে দিই। আপনি রেগে যাবেন না যেন।

না, রাগি নি।

তা হলে?

ইন্দ্র এতক্ষণে বুঝল, তুষার পাত্র অতীব বুদ্ধিমান এবং নকুলে ছেলে। ও নিজে কিছু বলবে না, ইন্দ্রকে দিয়ে বলাতে চায়। বহোত খুব। শাবাস! হ্যাঁ, এরকম মারপ্যাঁচ ইন্দ্রর পছন্দ!

তা হলে আপনি কাজ করুন। শুরু হোক বাকুলি থেকে। বাকুলিতে ক-জনকে পেয়েছেন যেন?

কাদের ক-জন?

'চ' থেকে 'হ'।

বর্গাদার স—ব খেতমজুর। শুধু হারাণ মাঝি আর লবণ মাঝি বর্গা করে। সূর্য সাউর ছেলে মহাবীরের জমি। মহাবীর সাউ! কিন্তু এ তো রোতোনির সাম্রাজ্য।

এখানেই হবে। চলুন।

আপনি চরসা যাবেন যে?

চরসা ঘুরে আসছি আমরা।

চরসার দিকে হাঁটার সময়ে দীপু, রজত, গৌর ও কদম বলছিল, খুব ভালো হবে ইন্দ্রদা। নানা গোলে মোরা ভি ফাঁপরে পড়ছি, কামটো হলে সকল ঠিক হই যাবে।

নিশ্চয় হবে। অপারেশন বর্গা পার্টি নীতি, পার্টির প্রোগ্রাম। আমরা সে প্রোগ্রাম সফল করব।

উদ্ধব আর সোরেন কিন্তুক কুনো বাগড়া দেয় নাই এখুনো। উয়ারদের ইন্দ্রদা! টানলে আমরাদের সাথ সামিল হবে। না কি বল? উয়ারদের কথা?

নিশ্চয় চেষ্টা করব। আগে জানতে হবে ওরা এখনো আগেকার রাজনীতি করে কি না।

মনের কথা কে জানে? কামে কিছু করে না। বরং আমারদের সকল কামে রতন কাকাদের সোরেন আগায়ে দিছে। রতন কাকার ছেলার সাথ মিটমাট তো সি করাছে।

জানি। রতন ডোম, উদ্ধব কাওরা, দিলীপ সোরেন—চরসায় আমাদের খুঁটি গাড়তে এদের সঙ্গে রাখতে হবে। এরা চরসার আপনজন। আমরা বাইরের।

চরসায় ওদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ সোরেন ওদের তাড়িয়ে বের করে। ঘটনাটি যথেষ্ট নাটকীয়।

বস্তুত, এহেন নাটুকে প্রস্থানের জন্যে ইন্দ্র তৈরি ছিল না। চরসা নদী, ওপারে বালিচর ও এবড়োখেবড়ো ঝামাটে প্রান্তরের পর চরসা জঙ্গল, নদীর কোলে ডাঙা জমিতে চরসা গ্রাম—দেখে মুগ্ধ হচ্ছিল ইন্দ্র। হ্যাঁ, ছবিতে আঁকা যেন। নদীতে খালকাটা হবে, নদীটিকে কয়েকটি খাল কেটে জুড়ে দেওয়া হবে বাস্তানী নদীর সঙ্গে। জল, সেচ, মাটির উর্বরতা। চরসার ওপর সেতু হাইওয়ে ঢুকে যাবে। জঙ্গল কাটা পড়বে। সামন্ত বলেছে, দুরধিগম্যতার কারণে আন্দোলন হয় এ-সব জায়গায়। যে-সব জায়গায় যাওয়া যায় না, সেখানে হাইওয়ে চেপে ঢুকে পড়ো লাখে লাখ। আন্দোলন বন্ধ। আজকাল সবাই থিওরি দিতে চায় কেন? তত্ত্ব?

এ-সব ভাবতে ভাবতেই ইন্দ্র ঢোকে চরসায়, এগোতে থাকে, এবং রতনের বাড়ি খুঁজতে গিয়ে শোনে এক বিলাপ, চেএ দেখা অ সনার মা!

খাটুলিতে কাকে আনা হচ্ছে। পাশে কাঁদতে কাঁদতে আসছে এক সমর্থ প্রৌঢ়। ছোট ভিড়। রতন গামছা ঘোরাচ্ছে এবং প্রৌঢ়টিকে প্রবল বকছে।

ক্যাকাশে নীল কলার দেয়া গেঞ্জি ও ধুতি পরা এক সাঁওতাল

যুবক ওদের দেখে, এগিয়ে আসে এবং ইন্দ্রকে বলে, ইন্দ্রবাবু! আমি সোরেস, দিলীপ সোরেন। দীনুদের সঙ্গে আসতে দেখেই চিনেছি। চলুন, চলুন শীগগির।

কোথায় ?

মাতং ডোমের বউ, পেটে ছেলে ছিল, আছাড় খেয়েছে—অজ্ঞান হয়ে গেছে। চরসা ব্লক হাসপাতালটা এগিয়ে—বাস্তোনী গ্রামে। আপনারা সঙ্গে থাকলে ভর্তি করতে সুবিধে হবে। ডাক্তারের সঙ্গে আমার তেমন বনিবনা নেই।

ইন্দ্র বলে, চলুন। দীনু, কদম! আপনিও আসুন। রুগীর ঘাড় টলছে ভাঙছে। খাটুলি নিয়ে দৌড়তে হবে। রজত, তুমি সামনে যাও।

সোরেন উদ্ধবকে ডাকে। বলে, আপনাদের ঝোলা, ব্যাগ, সব একে দিন। উদ্ধব কাওরা। ঠিকসে ধর ভাইরা। হেই, দু জনা দু ধারে চাপি ধর কেনি সনার মারে ? মোরা ছুট কদমে যাব, সি যেমুন টাহাল না খায়। পড়ি যায় না যেমুন—চল!

প্রায় দৌড়ে চলে ওরা। খাটুলিতে চাটাই কাঁথা বিছানো। অজ্ঞান মেয়েটির শরীর চলার তালে দোলে। আঁশটে গন্ধ। সোরেন বলে, রক্ত ভাঙছে। এ আর মর্নে হয় না—

চরসা-ব্লক-হাসপাতালে ছয়টি শয্যা। এগারোটি রুগী। ডাক্তার ও নার্স ছুটে আসে। ডাক্তার বলে, জাগুলা নিন। এখানে এ রুগী?

ইন্দ্র বলে, আজ সম্ভব নয়। এখন যা করবার করুন। সে পরে দেখব।

দীনু বলে, আমাদের কমরেড ইনি।

টেবিলে শোয়ান হয় সনার মাকে। সোরেন বলে, ওষুধ ইনজেকশন সেদিনই এসেছে, বের করুন।

ইন্দ্র বলে, হ্যাঁ, যা আছে বের করুন। অন্ধকার হবে এখনি। হ্যাজাক কোথায় ?

রতন বলে, ডাক্তারের ঘরে, আর কুথা ?

হ্যাজাক আনা হয়। জ্বালে দীনু। সোরেন কদম ও উদ্ধব জল গরম করে, যন্ত্রপাতি ফোটায় জলে। নার্সটি ডাক্তারকে সাহায্য করে।

অত্যন্ত অদ্ভুত পরিবেশে জটিল অস্ত্রোপচারটি সমাধা হতে হতে রাত অনেক হয়। দশটা নাগাদ ডাক্তার বেরিয়ে আসে ঘেমেচুমে। বলে, ভয়ানক ঝুঁকি নিলাম। এখন ওর কপাল।

ভোর নাগাদ বোঝা যায় মাতঙের বউ বেঁচে গেল এবার। মাতং ও আরেকজনকে রেখে ইন্দ্ররা এবার চরসা ফেরে। সোরেন বলে, আমার ওখানে চলুন। চা খাওয়াব।

প্রচুর চায়ের লিকার লবণ সংযোগে। মুড়ি। দিলীপের ঘরটি ছোট, কিন্তু দোতলা, দিলীপ বলে, শোবেন তো শুয়ে পড়ুন। উপরে উঠে যান।

দোতলার ঘরে ওঠে ইন্দ্র মাটির সিঁড়ি বেয়ে। খড়ের টোপ চাল। দেয়ালে দু দিকে গোল জানলা। মেঝেতে খড়ের ওপর চট বিছানো। মাটির ধাপে কয়েকটি বই। কি বই? 'গৃহস্থের টোটকা ঔষধ', 'লতাপাতার গুণাগুণ', 'গৃহপালিত পশু চিকিৎসা', 'ছড়া ছবিতে অ আ'। বইগুলি বহুবার ব্যবহারের ফলে ছেঁড়া ছেঁড়া ও ময়লা। পরিষ্কার ঘর। খড়ের গন্ধ। ইন্দ্র ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙলে ও নেমে আসে। বেলা কি অনেক? ঘড়ি বলে সোয়া দশ। দীনু বলে, চলেন, নাহাবেন তো।

সোরেন কোথায়?

হাসপাতাল গিছে। আসবে। ভাত রানবে আসি। রতন ভি তাই বলল। সি ডিংলা আনতে গিছে।

সোরেনের এ ঘরটা চমৎকার।

উপরের ঘর উ বানাছে।

ঘরটি সাঁওতাল বস্তিতে। এক মেঝেন চাল নিয়ে আসে ও

দাওয়ায় রেখে যায়। রতন একটি মাঝারি কুমড়ো আনে। বলে, ঘরে তুল, ঝাঁপটো ফেলি দাও। তা বাদে নাহায়ে লাও।

ইন্দ্র বলে, চালের দাম, কুমড়োর দাম কত হল বল রতনদা।

কেনি ?

দাম না নিলে খাওয়া নেই।

দিও দাম।

সোরেন হলুদ ও লঙ্কা নিয়ে চলে আসে, ছোট শিশিতে তেল। দাম দেয়ার কথা শুনে ও অত্যন্ত সাদা দাঁতে ঝিলিক দিয়ে হাসে ও বলে, নিশ্চয় দেবেন। চলুন, স্নান করবেন।

স্নানের তাড়া কেন এত ?

দঁকে জল শুকিয়ে যাবে বেলা হলে।

চৈত্র না পড়তে ?

চৈত্র না পড়তে।

চরসার বুক খুঁড়ে পাথরে জল আটকানো হয়েছে। কাঁচের মতো নির্মল জলে স্নান। ফিরে এসে ভাত বসায় সোরেন। কুমড়োটি কাটে। উদ্ধবকে বলে, ডিংলা রান্‌তে লবণ ভি লাগে।—তারপর ইন্দ্রকে বলে, ওটা উদ্ধব দেখবে এখন। বস খানিক। 'তুমি' বললাম, 'আপনি' বেশিক্ষণ চালাতে পারি না।

নিশ্চয় বলবে।

চল, উপরে বসি।

ওপরে ওঠে ওরা। অতীব যত্নে ঝাঁকড়া চুল আঁচড়ায় সোরেন। চিরুনি মুছে রাখে। তারপর বলে, সোরেন আর উদ্ধব—আমাদের কি জানবে বলে এসেছ ?

তুমি কে ?

দিলীপ সোরেন।

লেখাপড়া শিখেছ কোথায়, মুখের কথায় আড় নেই তোমার, নিজের সমাজে ছিলে না ?

জাগুলায় লেখাপড়া, হোস্টেলে থেকে। স্কুলের নাম ঠিকানা দেব? খোঁজ নেবে?

জাগুলায়?

সোরেন কেটে কেটে বলে, হাঁ ইন্দরবাবু! সামন্তবাবু মোরে চিনে, মোর মারে চিনে। মা ধান ভানি মোরে পালত। তা বিডিওবাবু মোরে লয়ে স্কুলে দেয়। মাটো মর‍্যে গেল, তাথেই হেথা এস্যে আছি। দোষ করছি কিছু?

আমি তোমায় অপমান করি নি সোরেন, কৌতূহলে জানতে চেয়েছি। তাতে অন্যায় হলে মাপ কোরো।

এখন জানলে।

চাকরি তো পেতে পারতে তুমি?

চেয়েছিলাম। পুলিশের কাজ দিতে চাইল।

পুলিশের কাজে খুব ঘেন্না, তাই না?

তুমি কর না?

করি।

সাঁওতাল হয়ে সাঁওতালের ওপর গুলি চালাতে হয় যদি কোন দিন? ভয় পেলাম, ভীষণ ভয়।

আরো তো কাজ আছে।

আছে। বহুজন পেয়েছে, করছে। আমি পাই নি। আর চরসাতে যাওয়া আসা ছিল। খানিকটা জমি পেলে তাতে চলে যেত। তাই ভাবতাম।

জমি পেলে?

জমি পেলে। মা বলত, কবে কোন্ কালে আমাদের জমি ছিল। নদী সরে সরে যাচ্ছে—জমি আর আমাদের থাকে নি—কবে থেকে থাকে নি তাও মা বলতে পারত না। মায়ের জন্মের অনেক আগে সে সব ঘটে যায়। মা বলত, জমি একটু হত যদি।

মা তো নেই।

না। এ-সব কথা বলতে বন্ধুরা বলত, সাঁওতাল তুই, এ কথাতেই বোঝা যায়। আর কি বলি, আমি যে সাঁওতাল, তা বার বার মনে হতই। কোনো কারণে ছেলেরা হরতাল করলে আমিও যোগ দিয়েছি, আর এমন কথাও শুনেছি, সাঁওতাল আমি! সরকার আমার জন্যে এত করছে, কিন্তু সে সব ভুলে আমি এ-সব কি করছি? ভোজের সময়ে, বন্ধুর বোনের বিয়েতে, সবাই দেখেছে হাঁ করে আমাকে। বন্ধুর মা বলেছেন, খেতে কষ্ট হচ্ছে না তো তোমার?

কেন বলেছেন?

আমি সাঁওতাল তো। তাই আমার প্রতি বেশি বেশি বিবেচনা দেখিয়েছেন। কিন্তু আমার ভালো লাগে নি।

না লাগবারই কথা।

সাঁওতাল হিসেবে চাকরি পাব, এ কথা জানতাম। সেবার জামা, মানে বুশশার্ট আর আর প্যান্ট কিনেছিলাম, জুতো। বৃত্তির টাকা একসঙ্গে পেয়েছিলাম। চরসায় যাই-আসি। থাকি ভূষণের ঘরে। ওকে কাকা বলি। ওর মা আমার ঠাকুমা। শার্ট-প্যান্ট পরে আমার ফুর্তি কত। গ্যাটম্যাট করে পাড়ায় হাঁটব। সবাই দেখবে। সবাই!

সে কতদিন আগে?

বেশিদিনের কথা নয়। চরসার মাঝিপাড়ায় তো আমার খুব কদর। হ্যাঁ, আমাদের কালী মেঝেনের ছেলে লেখাপড়া শিখেছে। চরসায় শিক্ষিত সাঁওতাল নেই, ও হল শিক্ষিত। নামটা নিয়েছে অন্য সমাজের, তা নিক। কি হব আমি, তাও জানতে চায় সবাই। শিক্ষক হব? না বিচারক, না ডাক্তার? একটা কিছু হয়ে আমি কি সরে যাব না গ্রাম সমাজ থেকে? কত প্রশ্ন ওদের।

এ-সব ওরা বলত?

হ্যাঁ, বলত।

তারপর ?

শার্ট-প্যান্ট আর জুতো পরে গেলাম ও বাড়ি। ঠাকুমা, আমরা বলি গডম্ আয়ু, সে আমাকে দেখে প্রথমে হতবাক্। তারপর মাথা থেকে কাঠের বোঝা নামিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, তুই পুলিশ হলি ? পুলিশ ? পুলিশের কাজ নিলি ?

আঘাত পেয়েছিল।

ভীষণ। আর ওর কথায় আমি যেন নিমেষে বুঝলাম, না, পুলিশ আমি হতে পারি না। বুঝলাম, বললাম, না গো ! পুলিশ কেন হব ? ও কি বলল জানেন ?

কি ?

বলল, তুই কি জানবি বাপ ? কতটুকু বয়েস তোর ? তোর মা আমার চেয়ে কত ছোট ছিল। আমি তো অনেক দেখেছি। চিরকাল যে দেখেছি। চিরকাল দেখেছি, পুলিশ সাঁওতালের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে রাখে।

বলল ?

নিশ্চয়। তখনি আমি জানলাম, আমি পুলিশ হব না। আর তার পরেও আমাকে পুলিশের চাকরি করতে বলা হয়।

নাও নি।

নিতে পারি নি। সামন্তবাবু খুবই চটে যান। আর সকলেও ছি ছি করতে থাকে।

তারপর এখানে এলে ?

না। চিনেবাদাম থেকে জুতোর ফিতে সবই বেচার চেষ্টা করলাম। শেষে বিক্রি করি মাথার টোকা। ধর্মরাজের মেলা এখন ফেশানী বেড়াবার জায়গাও বটে। আর ধর্মরাজের মেলা দেখে জারুলিয়া ফরেস্ট বাংলায় যাওয়া যায়, থাকা যায়। সেখানে হরিণ, ময়ুর, তিতির রেখেছে জালঘেরায়। শহরের মানুষ টোকা দেখে কিনে নিল। এবার মেলায় তালপাতার ছাতা নিয়ে যাব কয়েকটা।

টাকা হাতে থাকতে থাকতে চরসা চলে এলাম।

এরা কি বলল ?

প্রথমে দুঃখ পেয়েছিল। আমাদের কালী মেঝেনের ছেলেটা কিছু হল না গো। এখন বলে না কিছু।

সোরেন, তুমি কি সব বললে ?

দিলীপ সোরেনের চোখ হাসিতে উছলে পড়ল। সে বলল, সব কি বলা যায় ? মনেও থাকে না।

এখন কি করছ ?

লেখাপড়া শিখে স্ব-সমাজে বাস করছি।

স্ব-সমাজে ?

ছোট গ্রাম। এক সঙ্গে মার খেয়েছে সবাই এক কালে। সমাজটা এখানে মিলামিশা।

বলতে বলতে কি ভাবল সোরেন। তারপর বলল, উদ্ধব কাওরা বহুত ছেঁচাবোঁচা খেয়ে এসেছে। ভালো ছেলে, কাজ করতে চেয়েছিল। কিন্তু না ওকে বিশ্বাস করে কেউ, না আমাকে। তাতেই আমরা সরে থাকি। চরসা খুব সয়েছে সে সময়ে, আজও সইছে। রতনের বয়েস অনেক। আমি আর উদ্ধব এরাদের সঙ্গে থাকতে এরাদের মনে ভরসা। বুঝ ?

বুঝি।

এখানে খেতমজুর সবাই। বুঝ ?

বুঝি।

চল, ভাত খাবে চল।

ভাত, কুমড়োর ঝাল তরকারি। সোরেন বলল, চাল আর ডিংলার দাম ?

চেয়ে নেব। যখন চাইব দিও।

উদ্ধব হঠাৎ বলল, দাম অনেক।

খাওয়া হয় শালপাতায়। মাটির খোরায় কুমড়ো, পোস্ত, শুকনো

তেঁতুলের টক। ওরা খেতে খেতে উঠোন দিয়ে সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ সার বেঁধে চলে গেল। ওরা মোড়াম পিটাই করবে সেই বাকুলি গিয়ে। সোরেন কথা বলল অনেক।

জঙ্গলটি নানাভাবে বাঁচায়। মহুয়া ফুলের পাপড়ি ওরা চাপটি ভেজে খাবে। জঙ্গলে মূল-কন্দও মেলে। সুদূর অতীতে এ-সব জায়গা জঙ্গলমহাল বলেই গণ্য হত। কপাল থাকলে জঙ্গলে খরা-সজারু-গোবি মেলে। মাংস খাওয়া চলে। রতনরাও কারে পড়ে সাঁওতাল হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলনির্ভর। কি করা যায়। খেতমজুরি কাজ নয় বারোমাসের। একমাত্র উপায়, সম্পন্ন চাষীর ঘরে বারো-মাসিয়া হয়ে থাকা। সেটি এখন আর চলে না তেমন।

বারোমাসিয়া ?

বারোমাসিয়া, ভাতুয়া, খাইবেগারি, পেটবেগারি আসলে সবই এক।

ব্যাপারটা কি ?

মাস মাইনে, বা বছর মাইনে আর পেট ভাতায় তুমি চব্বিশ ঘণ্টার গোলাম হলে। দরকার—অদরকারে ধান বা টাকা কর্জ নিলে, সে ঋণ বাড়তে থাকল চক্রবৃদ্ধি হারে। ফলে গোলামি শোধ হতে পারে। না হওয়াই স্বাভাবিক।

না হলে ?

ছেলেকে লাগিয়ে দিলে।

এ তো গোলাম করে রাখা।

আগে চলত খুব। এখনো খুব চলে। যেখানে রাজনীতিক আন্দোলন চলছে, বা লেখাপড়ার ফলে হাওয়া পালটেছে, সেখানে আর এতটা চলে না এখন। অবহেলিত অঞ্চলে খুব চলে। কদমকে শুধোও না। ও জানবে।

এর বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন হয় নি ?

শুনি নি। তবে কোনো অঞ্চলে রাজনীতিক সচেতনতা গড়ে

উঠলে এ প্রথার দাপট কিছু কমছে। একটু শহরঘেঁষা জায়গায়, জমিমালিক যেখানে বর্গা বা মজুর এড়িয়ে যেতে চায়, সেখানে ভাতুয়া ফুরণ শর্তে চাষকাজ করে। অনুপাতে কম।

কম কেন?

কেন না শহরঘেঁষা গ্রামাঞ্চল কম।

বাকুলিতে রোতোনি সাউর জমিতে বর্গা বসার কাজটা হোক। একটা একটা করে প্রতিটি অবহেলিত বিষয় ধরতে হবে।

ভালো, খুব ভালো।

তোমাদের সাহায্য দরকার হবে।

উদ্ধব বলল, নিশ্চয়। কিন্তুক ই ভি শিখার জিনিস, জানেন? জমির মালিক জমিন ধরি রাখল। মূল শিকড়ে চোট দিলম না। ভাতুয়া গুলাম রবে না আর, খেতমজুর যেনি মজুরি পায়, বর্গাদার পায় সুবিচার—ডালপালা কাটতেছি যেমুন বিষ গাছের। আমূল ধরি টান না দিলে—না কি, নকশালী হই গেল কথাটা? আগে কথা বলি নাই এত, বসাই যা বলছে, তা করছি। এখুন ভাবি যত, এই মনে লেয়।

দীনু হঠাৎ বলল, ইন্দ্রদা, খেতমজুরদের এক ক্যাম্প হছিল মিনাহাটে। অপিসারটা খুব বুদ্ধি ধরে। এমুন ঠেঙে ক্যাম্প বসান, যি সেথা কখুনো কুনো আন্দোলন হয় নাই। মকরবাহিনীর মন্দির, আর তার সেবাইত গুষ্টির যত জমিজেরাত। সেবাইতদের খেতমজুররা আসে। আমরাও গিছিলাম দেখতে। তা অধিক কি কব, খেতমজুরদের যখুন বলল, তুমারদের আসানী কিসে হয়? তারা মোরাদের বোকা বানায়ে দিল। বলে, ঊর্ধ্বসীমা বুঝি না, সকল জমি সরকারে লও, ফিন বাটি দাও। যার চাকরি আছে, বেবসা বসাত, দোকান-পাট বাস-লরী আছে, তারে জমি দিও না। যারা বলল, তারা জানে না নকশালী।

ওরাও বোঝে, ভাবতে শিখেছে।

সোরেন বলল, আমাদের কি মনে হয়, তাতে কি? যদি কিছু কাজ কর, আমরা তাতে সামিল হতে চাই।

ইন্দ্রর মনে লাফিয়ে উঠল একটা কথা। কেন? ভয়ে? ভয় পায় আমাদের?

সোরেন, আমাদের কার্যক্রমে তুমি বিশ্বাস কর?

এটা আমার দিক থেকেও বলতে পার, একটা চেষ্টা। হয়তো বা শেষ চেষ্টাও। চেষ্টা তো অনেকবার করেছি, প্রত্যেকবারই দেখেছি কেউ বিশ্বাস করে নি আমাকে। কেন? উদ্ধবের হয়তো একটা রাজনীতিক অতীত আছে, আমার? কিংবা এখনকার হিসাবে সাঁওতাল ছেলের কথায় যথেষ্ট টান নেই, তার উপরে সে লেখাপড়া জানে, পুলিশে কাজ করল না, অতএব সে অবিশ্বাস্য। তাকে বিশ্বাস করা চলে না। বিশ্বাস না-করে চলা, শুধু বিশ্বাস না-করে চলা কি সব সময়ে ভালো?

খাওয়া-দাওয়ার পর ইন্দ্র বলেছিল, তুমি চল, উদ্ধবও চল। বাকুলিতে দু জনই সাঁওতাল। তুমি সঙ্গে থাকলেই ভালোই হবে।

চল।

যেতে যেতে ইন্দ্র বলেছিল, বিশেষ করে সাঁওতাল পাড়াতেই থাকলে কেন? আর সাঁওতালদের জন্যে সরকার অনেক কিছুই করছে এখন, অস্বীকার করতে পার না।

হ্যাঁ, লেখাপড়ার সুযোগ দিচ্ছে, কাকে ঢোকাচ্ছে।

সব পুলিশের কাজে ঢোকে না।

তুমি আদিবাসী নও। বুঝবে না।

বল, বুঝতে শিখব।

আমি ফিরে এলাম সে জন্যে, থাকলামও সে জন্যে। তুমি যখন বল 'অনেক কিছুই করছে', আনুপাতিক হিসেবটা কখনো ভেবে দেখ? করছে, কাজ দিচ্ছে। ধীরে ধীরে নতুন একটা শ্রেণী জন্মাচ্ছে সাঁওতাল সমাজে। শিক্ষক, ডাক্তার, চাকুরে। কিন্তু

নিরানব্বই ভাগ এখনো ধানখেতের নানা কাজে, কয়লা খাদানে, অন্যত্র কুলী কাজে। আমি সেই সময়েই আরেকটা পর্যায় তৈরি করতে চেষ্টা করছি চরসায়। লেখাপড়ার সুযোগ পেয়ে স্ব-সমাজ ছেড়ে গেলাম না, ওদের মধ্যে থাকলাম।

তুমি তো একা।

কে বলে একা? সাঁওতাল পাড়াটাই দেখলে চরসার? গ্রামটা যাদের নিয়ে সেই রতনরা, কাওরারা, তারা তো সাঁওতালদের সঙ্গে এক কাজের ক্ষেত্রে? একই কাজ, একই আয়, একই বঞ্চনা। সেখানে একজন লেখাপড়া জানা লোক নিজেদের থাকলে ভরসা পায় ওরাও।

এ রকমভাবে পর্যায় সৃষ্টিতে তুমি একা।

মনে হয় না। সরকার শুনছি সিধু-কানুর লড়াই নিয়ে অনেক জাঁকজমক উঠাবে এবার। শুনেছ কিছু?

ভাসাভাসা।

ভাগনাদিহির মাঠের লড়াই, স্ব-সমাজের কত উপকথা, এরা জানে না কিছুই।

তখন ইন্দ্রর মনে ঝলকে ওঠে কথাটি। ও বলে, আমরা এখানে সাঁওতাল বিদ্রোহের জয়ন্তী উৎসব করলে খুব ভালো হয়, তাই নয়? কখনো হয় নি।

উদ্ধব বলে, চরসাতে সান্‌তাল লড়াইয়ের উৎসব? বহুৎ ঝামেলায় ফেলবে আপনারে।

'আপান' কেন?

সোরেন ঝকঝকে হেসে বলে, উদ্ধব! তু গিছিলি বসাই টুডুর সাথ। সান্‌তাল সঙ্গ করলি এত, এখনো 'আপনি আজ্ঞা' ছাড়তে পারিস নাই? 'তুই' সবার ভালো, শুনতে মিঠা, বলতে মিঠা 'তুমি' টো চলতে পারে। 'আপনি' ডাকে কুনো মিঠা নাই জানি দূরে রাখি দেয়।

ইন্দ্র বলে, যা বলেছ। আমি কুলীমজুর সমাজের লোক। 'আপনি আজ্ঞা' জানি না অত।

বাবুটো সাচাই রি উদ্ধব। কাম চলবে। সোরেনের একটি কথায় যেন ওরা কাছাকাছি আসে এবং এতক্ষণ নীরবে হাঁটা রজত হঠাৎ কদম, গৌর ও দীনুর কাঁধে টোকা মেরে গান ধরে,

হাতে হাতে বুনি ধান
হাতে হাতে কাটি ধান—

উদ্ধব বলে, কদম বাঁধিছে গানটো।

বাকুলি কাছে আসে।

এক নং চবসা ক্যানেলের বুক দিয়ে বর্ষায় চলে রাঙা জল পাড় ছাপিয়ে। এখন জল স্বচ্ছ, স্রোতেও টান ধরেছে। বাগানের ধারে দো-ফসলী আড়াই বিঘা ও চার বিঘা জমিতে হারাণ মাঝি ও লবণ মাঝির বর্গা রেকর্ড হয়। চারিদিকে রেতোনি ও মহাদেবের শত শত বিঘা জমি থাকে প্রাচীন ব্যবস্থায়, একচেটিয়া মালিকানায়। বিপ্লবী ভূখণ্ড দুটিতে পোঁতা হয় পার্টির ঝাণ্ডা। রেতোনি সস্নেহ চোখে ব্যাপারটি দেখে এবং বলে, খুব ভালো কাম হল একটো।

সব হয়ে-বয়ে যাবার পর বাস্তোনীতে তার বর্তমান ডেরায় ইন্দ্র যখন ফিরে যায়, তখন তার ডাক পড়ে জাগুলাতে। নবীনবাবু ঈষৎ শুকনো গলায় বলে, কাজটি ভালো হয়েছে, তবে বড় ইচ্ছে-স্বাধীন ভাবে করল ইন্দ্র, কারুক্কে জানাল না, এটি ঠিক হয় নি।

কে. জি. আর. ও. কাজ করল, আমরা সঙ্গে ছিলাম মাত্র।

ননীবাবু শুষ্কতর গলায় বলে, রোতোনি সাউর জমি নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি না করাই ভালো। আর চরসার সোরেন আর উদ্ধব বা গিছল কেন?

সোরেন আর উদ্ধবকে আমাদের প্রোগ্রামে সামিল করতে হবে।

এ জবাবে নবীনবাবুর মুখ শুকিয়ে যায় কিন্তু সামন্ত শুনে হেসে

ওঠে খিকখিক করে। বলে, ভালো ইন্দ্র, খুব ভালো! ওদের সুস্থ কার্যক্রমে টেনে এনে ব্যস্ত রাখা খুব ভালো। এই হল ঠিক ওষুধ, হাঃ হাঃ হাঃ!

ইন্দ্র বলে, তার মানে কি? তারা তো বার বার আপনাদের কার্যক্রমে সামিল হতে চেয়েছে।

কোনোদিন না!

ইন্দ্র বলতে যায়, রতন ডোমের কাছে যা শুনেছি, তাতে আমার বিশ্বাসও হয়েছে, আর আপনারাই ভুল করেছেন।

বলে না। শুধু বলে, এক সময়ে একটি গ্রাম বা কয়েকটি গ্রাম কোনো হিংসাত্মক আন্দোলনে নেমেছিল। সে পথ আমাদের নয়। কিন্তু যে কারণে নেমেছিল, কারণগুলো আরো বাস্তব, আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। সে কারণগুলো যথাযথ রইল, আমরা ওদের দূরে সরিয়ে রাখলাম, সেটা ঠিক নয়। ওদের সুখদুঃখে সামিল না হলে ওদের মনে বিশ্বাস আসবে না।

কেন, অপারেশন বর্গা?

ওটা খেতমজুরের গ্রাম। অপারেশন বর্গা? রোতোনি সাউ, রামেশ্বর ভুঞা, এদের আপনারা বাঁচিয়ে চলবেন, বর্গা বসবে ছোট ল্যাণ্ডহোল্ডিংে? সাচ্চা ক্যাডারদের মনে 'এতে কী ভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে জানেন?

সামন্ত মনে মনে ইন্দ্রর গলায় প্রতিবাদের সুরটি নোট করে নেয় এবং মুখে বলে, দলের শৃঙ্খলা রাখা সবচেয়ে বড় কথা ইন্দ্র। প্রথম পর্যায়ে ওদের কিছু করছি না। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। বর্তমান কাঠামোতে সব দিক বিবেচনা করে দেখতে হবে, যতটুকু করছি আমরা, তা আগে কোনো সরকার করে নি। এবং এ বৈপ্লবিক কাজের পথে আমরা নিশ্চয় হঠকারীর মতো এগোব না।

শুনতে শুনতে ইন্দ্র বলে, কী ভাবে এগোবেন? কি ভেবেছেন সে বিষয়ে? ক্ষমতাশালীদের বিষয়ে কি করবেন?

—তাদের বিষয়ে তো আলাদা নিয়ম হবে না কোনো। সরকারি কর্মচারীদের উচিত আইন বলবৎ করা। জমি ভেস্ট করুক, বিলি করুক, বর্গা বসাক—

বদলি হোক কাজ করতে গেলে, বাধা পাক্ প্রতি পর্যায়ে। যা হচ্ছে তাই বলুন। নির্ভীকভাবে কাজ করুন, সকলের শ্রদ্ধা নিন সামন্তদা। জনতার রায়ে এসেছি, ভয় কোথায় ?

ভয়ের কথা কে বলছে ? আমি কারুকে ভয় পাই না। ক্ষমতাশালীদের বুঝিয়ে, চাপ দিয়ে···

হৃদ্ পরিবর্তন আনবেন ? ওরা ডাকাত আর আমরা সর্বোদয় কর্মী না কি ? মাটিতে নামুন। যা প্রচার করছি, তা কাজে না করলে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন, পড়ছেন।

তোমার কথাবার্তা···

নকশালদের মতো নয় সামন্তদা, সাচ্চা পার্টি কর্মীর মতো। পার্টি থেকে ফায়দা তোলে নি এমন কিছু লোক আছে, আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন। কাজ করুন, কাজ। করতে দিন। আবার ভোট নিতে হবে না ?

নিশ্চয়। এবং আমরাই জিতব।

সে তো নেতিবাচক ভোটে। বিকল্প পার্টি নেই বলে। কিন্তু কাজ করব না কেন ?

কাজ কর না তুমি। কে বাধা দিচ্ছে ?

বাইরের বাধাকে ভয় পাই না।

প্রকৃত পার্টিকর্মী কোনো বাধাকেই ভয় পায় না। তুমি যে-সব কথা শুনেছ তা সত্যি নয়। আমি মনে করতে, মানে বুঝতে পারছি কোন্ সূত্রে তুমি কি শুনেছ। এই তো সাউদের জমিতে বর্গাদার রেকর্ড হল। তাতে কোনো দিকে কোনো বাধা পেলে কি ?

যেটুকু জমিতে হল, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সাউরা যে রকম বড় জমিমালিক, ওদের সব জমিই তো পড়ে রইল। এটাই আমার

মনে লাগছে বার বার।

একটু একটু করে এগোতে হবে।

খেতমজুরদের বিষয়ে কি করব?

সরকারি রেট পেতে চেষ্টা করব কিন্তু শান্তিপূর্ণ উপায়ে। জমিকেন্দ্রিক দুনিয়া তুমি বোঝ না। এ একেবারে বেজায় গোলমেলে জায়গা। আমাদের শত্রুরা মুখিয়েই আছে, বিরোধী চক্রান্তের শেষ নেই। জোরাজোরি করলে তা আন্দোলনে দাঁড়াবে, আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন এসে যাবে।

সামন্তদা, পার্টিকর্মী হিসেবে আমি জানতে চাই, আপনারা আন্দোলনকে এত ভয় পাচ্ছেন কেন? জোতদারের জমি ধরে রাখার অধিকার আছে, কর্মীপর্যায়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলন করে তেভাগার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার অধিকার নেই। ভালো মুখে জমিমালিক খেতমজুরকে সরকারি রেট দেবে? আমরা আন্দোলন করে তা আদায় করতে পারি, মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারি। বৈধ আন্দোলনকে এত ভয় কেন? শহরে তাই, গ্রামে তাই, এতে মজা পেয়ে—ভালো করেই জানেন আপনি, ব্যবসায়ী কালোবাজারী, ফড়ে ও পাইকার যথেচ্ছ দাম বাড়াচ্ছে আর মুনাফা লুটছে। কিন্তু দ্রব্য-মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনও সম্ভব নয় আজ। যে-সব আন্দোলনে সাধারণ লোকের আরো কাছে যাওয়া যায়, সব বন্ধ কেন? কর্মীদের শেখাব কি করে? নতুন ক্যাডার আসবে পার্টিতে, কোনো আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যাবে না তারা?

আন্দোলন বিষয়ে ধারণাও তো পালটাচ্ছে।

এবং, কোনো আন্দোলন হবে না জেনে, আপনারা যা দেখছেন না, ক্যাডার পর্যায়ে নৈতিক অবনতি ঘটবে, সাচ্চা ক্যাডারের মন ভাঙবে—ওদিকে যারা লুটেপুটে খাবার, তারা লুট চালাবে। এর পরেও ভোটে জিতব? নিশ্চয়। নেতিবাচক ভোটে। বিকল্প নেই বলে। কিন্তু মানুষ আমাদের ভালোবেসে, আমাদের উপর বিশ্বাস

রেখে ইতিবাচক ভোট দেবে, সে অবস্থা আমরা তৈরি করতে পারি, করছি না।

শিক্ষিত ভোটার তা বলে না ইন্দ্র।

তাদের যে আমরা বেতন হারে, নানা ভাবে পাইয়ে দিচ্ছি।

তুমি শুধু নেতিবাচক দিকগুলি দেখবে ?

পার্টি আমার জান সামন্তদা। এক আমার সাফল্যকে আমি অনেকদূর নিয়ে যেতে চাই। নিজেদের পিঠ নিজেরা চাপড়ালে এগোনো যায় না কি ? আপনি বলুন তো খোলা মনে ?

তাই যদি হবে, তবে—ঠিক আছে, কাজ কর। সোরেন আর উদ্ধবকে যত তাড়াতাড়ি টানতে পার, ততই ভালো।

বান্তোনীতে তার নতুন ডেরায় বসে থাকে না ইন্দ্র। মনের নিচে ক্ষত, ভীষণ অস্থিরতা। জ্যৈষ্ঠ আসবে তার ঝড় বৃষ্টি নিয়ে। আকাশের গতিক ভালো। জ্যৈষ্ঠে বীজতলায় বীজ ফেলা হবে আমনের। ধানের চারা জল পেলে বাড়বে। আষাঢ়ে-শ্রাবণে চারা নেড়ে দাও। এ-সব কাজে খেতমজুর নামবে মাঠে। সরকারি খেতমজুরি চাই।

হারাণ ও লবণ মাঝি এ বছর নিজেদের স্বত্বদখলী জমিতে বীজ ফেলবে। লবণ আসে হাসপাতালে এবং বলে, বীজধান ইবারে দিবে না বাবুরা। বলে, আইনের বলে জমি রেকড করাছিস, বীজ দিব কেনি ?

এতদিন কি করেছ ?

কেনি ? বীজ ধার দিছে, কাটান লিছে ?

হাল লাঙল ?

বলদ চেয়্যে লিয়্যসতম।

কার কাছ থেকে ?

গাঁ-বাসী দিত।

বীজের দরুন কী ভাবে কাটত ?

কেনি ? বারো আনা তার, চার আনা আমার ?

পেতে ?

কুথা পাব।

কেন পেতে না ?

বৎসর ভরি ধান বাড়ি লিব, টাকা লিব, তাতেও ধান থাকে ? এত বুঝ, ই কথা বুঝ নাই ?

কিছুই পেতে না, তবে চাষ করতে কেন ?

জমিন্‌টো বাঁজা রাখে কে ?

এ বছর কি করবে ? হাল লাঙল, বীজ, গরু, কিছুই তো নেই তোমার। এ বছর কি করবে জমি নিয়ে ?

লবণ আশাবাদী। সে বলল, হারাণটো যেমুন বলবে ? আমি তো বুঝি না কিছু, উ বুঝে। আমার গাছের ডিংলা এক টাকায় ছাড়ি দিব, উ কাড়ি লয়ে তিন টাকায় বিচবে। উ কুনো বুদ্ধি করবে লিচ্চয়। যেঁটা খুব, বুঝেও ভালো।

হাসপাতালে এসেছ কেন ?

অষুদ লিব।

দীনু ওর হাতের খালি শিশি দেখে বলল, খেয়ে লিছ না কি ? একেবারে নিঃশেষ যি ?

খেলম।

যাও, বল গা। দেখেন ইন্দ্রদা, পোড়া ঘায়ের তরে লাগাবার লাল অষুদ দিছে, খেয়ে লিছে।

লবণ বোঝাতে যায় যে ঘা তার পায়ে, ওষুধ খেয়েছে ঘরের গিদ্‌রা-পিদ্‌রা, ছেলেপিলে, এবং তাদের পেটের ব্যথা সেরে গেছে। বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে সে অন্য কথা বলে। বুদ্ধিমানের মতোই।

বাবু! জমিন্‌টো রেকড তো করাই দিলে, এখুন বীজ, লাঙল, বলদ যখুন সি দিছে, বারো আনা-চার আনা ভাগ হছে। ধর্মে

ভি বলে, আইন ভি বলছে, বীজ লাঙল বলদ আমার, বারো আনা লিব, চার আনা দিব ?

কদম বলে, আইন তাই ! কিন্তু ও মানবে না। আধা আধি ভাগ নেবে। তাই নিছে।

সি কামটো করি দাও ?

লবণ হাসে। বিশ্বাসের হাসি। ইন্দ্র আস্তে বলে, ফসল হোক লবণ, দেখা যাবে। আইন আছে, কিন্তু দেশাচারে যা চলছে তাও নিয়ম দাঁড়ায়-তো ?

কামটো করি দাও ?

ফসল হোক।

করজ বলি কাটি লিবে না অ্যানেক ?

না না, কর্জ আর নেই।

নিশ্চিন্ত হয়ে লবণ ওষুধ আনতে যায় এবং কি যেন ভুলে গেছে, এ রকম মুখ করে মাথা চুলকে গামছায় বাঁধা চারটি চিড়ে নামিয়ে রেখে 'তুমি' ভুলে গিয়ে বলে, তুরাদের লিয়্যেগে দিছিল বউ। জমিটো করাই দিলি ?

লবণ চলে যায়।

ইন্দ্র বলে, এখনো এত সরল।

রজত বলে, কয়ালরা ধান-চাল-মসুরি কিনতে উরাদের মাপে ঠকাছে, বাবুরা হাটে একটো টাকা ফেলি দুটা মুরগি উঠাছে, চিরকাল ! তা বাদে আটষট্-উনসত্তর হতে আর তেমুন নাই।

দীনু বলে, তখুন খুব ডর্যে গিছিল সব।

অসহিষ্ণু ইন্দ্র বলে, আবার ভয় করতে হবে। আচ্ছা, ও চট করে আইনে বারো আনা চার আনা ভাগ আছে—এ কথা বলল কেন ?

সোরেন বলি থাকবে। তারে তো মানে খুব।

সোরেনের আগে আমাদের বলা উচিত ছিল।

বললে বা কি ? কেউ বর্গাদাররে তেভাগা দিবে না।

দেখা যাক।

ইবার কি করব ? বসি যাব ?

না, বসব না।

কাজ চাইছিল দীনু, রজত, কদম ও গৌর। কদমখুঞা ব্লকের চরণ, মোহনবাঁশি আর ভূপালও আসা যাওয়া করছিল। ক্যাডার কাজ করতে চায়। কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরে পৌঁছতে চায়। তাতেই কি ইন্দ্রর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় ? নইলে কেন সে গেল সদর গ্রামে, মতি বাবুর জমি সরজমিনে দেখতে, বর্গাদারদের সঙ্গে কথা বলতে ?

সদর গ্রাম ও ব্লকেব ছবিটি অন্যরকম। সেখানে পুলিশচৌকি, ব্লক আপিস, গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা, মুরগি পালন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিশনারি আনাগোনা, তুলসী স্বামীপন্থী কীর্তন দ্বারা আত্ম উন্নয়ন কেন্দ্র, লাইসেন্সপ্রাপ্ত শুঁড়িখানা ও জনতা-সমবায়িকা-বিপণি। বসাই টুডুর পঞ্চম মৃত্যু সদর নামের কাছাকাছি চরসার জঙ্গলে ঘটে। তারপরেই সদর এত জেঁকে উঠেছে। নন্দিতা বরাট এখানে সমাজসেবা কেন্দ্র খুলে অনাথ শিশু পালতে চান। যথেষ্ট সংখ্যক অনাথ শিশু না থাকায় তাঁর শুভেচ্ছা কার্যকরী হয় নি। সদরে এ রকম সব হোর্ডিং দেখা যায়—

হিংসা বর্জন করুন। কৃষি উন্নয়নে ব্লক অফিসের সাহায্য নিন।

হিংসা বর্জন করুন, সঞ্চয়ে মন দিন, ঋণের জন্যে আসুন গ্রামীণ ব্যাংকে।

হিংসার পথে মুরগি পালন সম্ভব নয়। প্রকৃত প্রশিক্ষণের জন্যে আসুন এই কেন্দ্রে।

হিংসা নয়, যিশু আপনার সমস্যার উত্তর।

হিংসা করে কোথা যাবে ভাই ? তুলসীপন্থী কীর্তনামৃতে যে করে আত্মসমর্পণ, সে যে পায় তাঁকে।

হিংসার কথা ভুলে পদার্পণ করুন সমবায়িকা-বিপণিতে। কোদাল থেকে প্রেসার কুকার, সবই পাবেন।

এগুলি ছকে বাঁধা হোর্ডিং নয়। সদর সম্বন্ধে সরকারি বিশ্বাস, যেহেতু প্রশাসনের ভীতির কারণ বসাই টুডু সদর সান্নিধ্যে মারা যায়, যেহেতু ছানা বিক্রয়কেন্দ্র সদর গ্রামটিই হিংসার ধাত্রীভূমি। তাই অত্যন্ত মাথা খাটিয়ে হোর্ডিংগুলি রচিত হয়েছে। এ গ্রামের তেরোজন সাক্ষর লোকই যে গ্রামের বাইরে চাকরি করে, হোর্ডিংগুলি কেউই পড়ে না, সে কথায় হোর্ডিং মালিকরা আমল দেন না। শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে সদরকে বিপজ্জনক মনে করা হয় বলে প্রাইমারি স্কুল এখানে করা হয় নি।

সদরে অনেক রাজনীতিক মিটিং হয়। গ্রামের খোদ বাসিন্দারা গ্রামের রমরমায় খুবই খুশি। কেন না বিবিধ বিল্ডিং নির্মাণকল্পে অনেক জমি বেচতে পেরেছে। তারা যখন ছানা বেচে না, তখন মিটিং শোনে। হাতে টাকা আসার পর তারা যথেষ্ট মদ খাচ্ছে না, কিন্তু এ-ওর নামে দেওয়ানি মামলা করছে। কেন করছে, কোন্ মানসিক নির্দেশে, তা নিয়ে এক বিশেষজ্ঞ দল এসে সমীক্ষাও করে গেছে। মদের চেয়ে মামলায় এদের ঝোঁক কেন, তার কারণ নাকি গোয়ালের গো-মাছি। এই মাছির কামড়ে সরল গ্রামীণ মনে বিপর্যয় ঘটে এবং মদ ছেড়ে মন মামলা চায়। বিশেষজ্ঞরা গো-মাছিকে সকল কারণের মূল ধরে নেন। কিন্তু সন্ধ্যায় শোনেন এক মৌলিক শ্যামাসংগীত—

এবার ম'লে উকিল হব
তোমার মুণ্ডমালা সমেত মা গো
কাঠগড়ায় দাঁড় করাব॥

গানটি সদর গ্রামে খুব জনপ্রিয়। মতিবাবুর সাধক কাকা হরকালী সাহিত্যভারতী, বি. এল. রচিত। দেশের লোকের জন্যে অপেক্ষা না করে নিজেকে নিজে 'সাহিত্যভারতী' খেতাব দিয়ে,

ওকালতি পরিভাষায় শ্যামাসংগীত লিখে সম্প্রতি হরকালী সাধনো-চিত ধামে প্রয়াণ করেছেন। গানটি শুনে সমীক্ষকরা ঘাবড়ে গিয়ে সদর ত্যাগ করেন তাঁদের মৌলিক গবেষণাপত্র বগলে।

এহেন সদরে গিয়ে হাজির হয় ইন্দ্র। তুষার পাত্র আগে এখানেই ছিল। সে পইপই করে বলে দিয়েছিল, আমাকে ফাঁসাবেন না। আমি ওখানে জমি ভেস্ট করতে, বর্গা রেকর্ড করতে যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি। ওই একটা জমি নিয়ে পড়লেন কেন?

ভেস্ট করার মতো জমি কতখানি?

তা সাতাশ-আটাশ বিঘাই হবে।

এত?

কত লোক কত রেখে পার পেয়ে গেল মশাই! ওখানে যাবেন বলে মনে হচ্ছে। গোরাবাবু পুরনো লোক আপনাদের সমিতির। খুব সাহায্য করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত মিলিটারি।

আমি তো দেখতে যাব!

ইন্দ্র কিন্তু মতিবাবুর জমি দেখতে পায় নি। গোরা বলেছিল, এখানে তোমার ঢোকার কোনো দরকার নেই। ইন্দ্র প্রামাণিক! নিজেকে ভাবো সব চেয়ে সাচ্চা, কেমন?

ইন্দ্র বলেছিল, নিজেদের মধ্যে কোনো ঝামেলা চাই না। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারটাকে আপনি খোলাখুলি সাদা মনে নিতে পারছেন না। আপনার নিজের জমি আছে?

নিশ্চয়। সবার থাকে

না, সবার থাকে না। সে জমি?

ভেস্টেড। বর্গাদার রেকর্ড খতম।

মতিবাবুর জমিতে বর্গা বসে নি কেন?

বর্গা নেই বলে।

আমার খবর, আছে।

না, নেই। 'নেই' বলেছি, নেই। করাক রেকর্ড, চেষ্টা করুক, বেইজ্জত হবে।

কি ব্যাপার বলুন তো? এই একটা জমি ভেস্ট করিয়ে বর্গা বসালে কত ভালো হত?

গোরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত। তবু সে বলে ফেলল, সে তুমি-আমি বুঝলে হবে? আমাদের জমি?

মতিবাবু এ রকম করলেন?

মতিবাবু কিছুই করে নি। মতিদা আসে না, জানে না, খবর রাখে না। তার ভাগ্নেরা বুঝেছ? তারাই জমি বাড়িয়ে বাড়িয়ে অতখানি করেছে। মতিবাবু বিয়ে করে নি, সংসার করে নি, সারা জীবন বিধবা দুই দিদি সংসার টেনে গেল—জমিজমা তাদেরই দিয়ে দেয়।

ভাগ্নেরা মামার পরিচয়ের সুযোগ নিয়েছে।

হ্যাঁ, প্রচুর ব্যাপার।

সেজন্যেই এটা সাফ করা দরকার ছিল।

কি করে? তাদের পরিচয় জান?

প্রচুর তর্ক ও বিতর্ক চলে। ভাগ্নেরা যথেষ্ট বিত্তবান ও প্রতিপত্তিশালী ভেবেছিল ইন্দ্র। কিন্তু গভীর রাতে তার ঘুম ভাঙায় জনৈক পুলিশ ইনসপেক্টর। বলে, আমাকে চৌকি ছেড়ে আসতে হল। আপনি এখানে অপ্রয়োজনে ঝামেলা করছেন কেন?

ইন্দ্র ঘটনাটি বিবৃত করে। যতক্ষণ বিবৃত করে, দীনু ওকে খোঁচাতে থাকে। ইনসপেক্টর চলে গেলে দীনু বলে, ছোট ভাগ্নে। দু জনেই পুলিশ।

পুলিশ যখন মামার জমির মালিক, তখন অধঃসীমার জমি ঊর্ধ্ব-সীমা ছাড়াবে। এবং সে জমি ভেস্ট হবে না, সরকারি পরিভাষায় 'সরকারে নিহিত' হবে না—তা প্রবল জেদী ইন্দ্র গভীর রাতে প্রবল

মানসিক বাধা সত্ত্বেও বোঝে এবং গুম হয়ে বিড়ি ধরায়।

পুলিশের দাপট কমবে কবে ?—বলে ও শুয়ে পড়ে পড়ে। এখন দীনু বলে, লতিদা কুনোদিন চেয়ে দেখে নাই। তুনো জনা আগের মন্ত্রিসভায় কাজ নিছিল, তারাদের লোক।

তুমিও বলেছিলে, মতিদার জমি আছে।

মতিবাবুর নামে। একে পুলিশ, তাতে মামার নামকুলজি ভাঙাছে তাতেই—।

হ্যাঁ, দীনু।

তুমি না পারলে কেও পারবে না।

দীনু, বাস্তব অবস্থা অস্বীকার করে লাভ নেই। গ্রামে বসে দারোগার জমিতে বর্গা বসালে, প্রতি বর্গাদার বিপদে পড়বে। কিন্তু এ এখানেই কাজে আছে কি করে ?

সি বলতে পার।

সকালে গোরা এসে উঁকি মারল। বলল, ওই একটা জায়গা খুঁতো হয়ে আছে, নইলে কাজ যা হচ্ছে, চমৎকার। কালকেই যাব আমরা, শিকদারের জমিতে বর্গাদার বসবে।

মানুষ সভ্য হচ্ছে সমিতির।

সদস্য বল, 'সভ্য' কি ? হচ্ছে, সদস্য হচ্ছে। হবে না কেন। তারা কি দেখছে না আমাদের ?

ফেরার সময়ে একটি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ঘর ও ঝোপজঙ্গল দেখিয়ে দীনু বলে, উদ্ধবদের ছিল।

কেউ ঘর তোলে নি ?

এর ভিটায় উ ঘর তুলে না চট করি।

সদরের অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র অত্যন্ত মুষড়ে পড়ে এবং সোরেনকে কথাগুলি বলতে ইচ্ছা হয় তার। ভেতরে থেকে বাধা কোথাও। সোরেনও বোধ হয় বোঝে, যে ইন্দ্র মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়ে গুমরে আছে। একদিন সে চলে আসে ইন্দ্রর কাছে।

বলে, নিমন্ত্রণ করতে এলাম।

কিসের ?

ডোম পাড়ার মদন আর পারীর বিয়ে।

কবে ?

এই বৈশাখে। এখন চিন্তা বিস্তর।

কী রকম ?

পাত্র আর পাত্রী তো রাজি খুব, কন্যাপণে গোল।

কত ?

বিশ টাকা।

বল কি ? বিশ টাকাতেই বউ মিলবে ?

সোরেন হাসে। বলে, মিলত কি আর ? এক সময়ে পাঁচ টাকা দিলে চলত। বেড়ে বেড়ে বিশ টাকা হল। তারপর শহরের বাতাস ? খরচ-খরচা বেড়ে গেল, টাকা বেশি দাও। নাইলন শাড়ি দাও, রোলেকস জরি দাও, রুপোর গয়না। ছেলেগুলো কি চুরি করতে যাবে ? তাতেই সমাজ ডেকে আমরা নিয়ম বেঁধে দিয়েছি। বিশ টাকার উপর পণ নাই, লাল সুতি ছাড়া কন্যাবস্ত্র নাই। দস্তা ছাড়া গয়না নাই। সমাজ-ভোজে ডাল, টক, মাছ। যার যা দিবার, ঘরে নিয়ে দিবে।

বাঃ, ভালো করেছ।

মদন আমাদের এক যুতের পাত্তর। ঘর ছিল না, সবাই মিলে ঘর বেঁধে দিলাম। ছাগল বেচে টাকা জোগাড় কর, তা ছাগল নিল শিয়ালে।

—কিছুক্ষণ ভাবে সোরেন। বলে, চাঁদা তুলে বিয়ে করবে আর কি !

বিয়ের সমাজ-ভোজ কি করে হবে ?

কেন ? ডাল, চাল পাঁচজনার আছে ? মাছ বলতে কি রুই-কাতলা বুঝ ? না না না। আমি তো প্রচার দিয়েছি লাঠা-

বেলে-সিং-টেংরা-পুঁটি-চিংড়ি কুলীন মাছ—রুই-কাতলা হরিজন। সে জন্যে নয়।

আমি কি করব ?

ভাই! তোমার কাছে লুকাব কি, মদন বেটা ফাঁড়িতে আটক। জোগাড়ে বিয়ে আটকাবে না—কিন্তু পাত্র ছাড়া বিয়ে হয়? শুনেছ কখনো ?

মুশকিল, অসুবিধেও বটে। কেসটা কি ?

ধর্মরাজের মেলায় চরসার ডোমরা চেগা নিয়ে আসে, তারপর মেলায় ঢেলে বেচে বাঁশের জিনিস। দোকান-তোলানি উঠানো নিয়ে জাগুলা থানার পুলিশের সঙ্গে ডোমদের পুরনো বিবাদ। মদন গত বছর খুব মিলিটারি মেজাজে পুলিশ-খেদা করে।

কেন ?

আগের সরকারে দিতাম, এখনো দেব ?

বিবাদটি চলাকালে মদন সম্ভবত অত্যন্ত মেজাজে ছিল। একটি মাছের খালুই ও ফট করে কনস্টেবলের মাথায় পরিয়ে দেয় টুপি করে। মস্ত খালুই, ফাঁদালো মাছ রাখার জন্যে তৈরি। ফলে সবাই খুব হাসে ও পুলিশকে ফুটে যেতে বলে।

তার পরিণামে মদন হাজতে বা থানায়। জাগুলা বাজারে ওকে দেখে হঠাৎ ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। সে নাকি দিনদুপুরে মদ খেয়ে শান্তিভঙ্গ করছিল।

তুমি যদি তাকে ছাড়িয়ে আনতে পার।

দেখি।

দেখ!—গভীর উদ্বেগে সোরেন তার অর্জিত বুলি ত্যাগ করে। বলে, পাত্রীটা কেন্দে কেন্দে চক্ষু রাতা করি ফেলাইছে, মদনের মায়ের কেচাকেচা শুনি পাগল হই গেলম যেনি। চাল, ডাল মৌজুদ আছে, পুঁটি চ্যালা ভি বিস্তর পাব—ই কি দুর্ভোগ বল ?

ইন্দ্র হাসে হো হো করে। বলে, অনেক আপন মনে হয়

এ ভাবে কথা বল যখন।

তাই? বেশ!

মদনকে ছাড়াবার ব্যাপারটি খুব সোজা হয় না। মতিবাবুর সঙ্গে দেখাই হয় না। নবীনবাবু বলে, মতির জমি নিয়ে হাঙ্গামা ওঠাচ্ছ, একটা ছিঁচকে মাতালকে বাঁচাতে ছুটে এসেছ, এগুলো ঠিক করছ কি?

অনেক চেষ্টায় মদনকে ছাড়ানো যায়। ফলে ইন্দ্রর ইজ্জত খুব বাড়ে এবং হঠাৎই ও মদন ও পারীর বিয়ের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। সাঁওতাল ডোম কাওরা, চরসার তিন সমাজের লোককে মিলিয়েছে যে সোরেন, তার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। সোরেনের সাফ কথা।

গাঁ-গেরাম ছোট, কামে-কাজে এক, বানে-আকালে এক দুখ, সকল অবস্থায় এক হই আছি। তাতেই ই বেবস্থাটো। এখুন আমারদের পরবে ভি উরা আসবে। উরাদের পরবে ভি মোরা যাব। আমি আদিবাসী, উ ডম, সি হিসাবে চলে?

যেন তার কথার সমর্থনেই মদনদের বিয়ের আগে বাজে ঢোল, ধামসা, শিঙা। ডোমরা বনে গিয়ে মঙ্গলচণ্ডীর পুজো দেয়, সমস্ত গ্রামটি যায় পিছনে।

ই পূজাটো দিতে হয়—রতন বলে, মঙ্গলচণ্ডী বল, বাগুলী বল। বনের সকল উনি রক্ষা করে।

বৈশাখে বৃষ্টিতে আকাশে তাপ ছিল কম, বাতাস ছিল মধুর। চরসা নদী পেরিয়ে বনে ঢুকতেই গাছপালাগুলি বাতাসে দুলে ওদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। প্রাচীন বটগাছটি অপেক্ষায় ছিল ওদের জন্যে। তার গোড়া ঘিরে গাছের আঙিনা পরিষ্কার করে লেপা। সেখানেই পুজোর ব্যবস্থা। মঙ্গলচণ্ডীর উদ্দেশে রচিত গান গাইছিল রতন কফবসা স্বরে। অন্যদিকে রান্নার ব্যবস্থা। আজ এখানেই বনভোজন। খেসারি ডালের খিচুড়ি ও আমচুরের টক।

খুব ভালো লাগছিল ইন্দ্রর। আশ্চর্য শান্তি। সোরেন ওকে ফেলে কখন উঠে গেছে ও বোঝেওনি। সোরেনকে খুঁজতে গিয়েই ও চরসার জঙ্গলের ভিতরে ঢোকে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে চরসা গ্রামবাসী ও সোরেনের সম্পর্কের রহস্যভেদ করে। যতক্ষণ তা না হয়েছিল ততক্ষণ তার ধারণা ছিল, এরা তাকে বিশ্বাস করে সম্পূর্ণই।

জঙ্গলটি তাকে টানছিল।

এ জঙ্গলের কথা খুব শুনেছে ও একসময়ে। শাল, পিয়াসাল, কেঁদ, খিরিস, পলাশ নানা রকম গাছ এখানে। বট, অশ্বত্থ ও তেঁতুল। মাঝে মাঝে বাঁশবন। একদিনের জঙ্গল লাটের শেষ চিহ্ন। বনবিভাগ সংরক্ষিত। চরসা নদী এক সময়ে বার বার স্রোত পথ পরিবর্তন করার ফলে নদীর পরিত্যক্ত অববাহিকায় জঙ্গল। বর্ষার বন্যায় চরসার প্রবল জলস্রোত এই বনভূমির জন্যেই অপরদিক ভাসায় না এই সত্য বুঝে বনবিভাগ জঙ্গলটি নির্মূল করে নি ও শুধুই শালবন সৃষ্টি করে নি। ঘন ঝোপঝাড় বিস্তর, তাতে জল আটকায়। দুরধিগম্য এই বন এক সময়ে এ অঞ্চলের রক্তাক্ত এক ইতিহাস নীরবে দেখেছে। অপারেশন বসাই টুডু।

কিছু জানত ইন্দ্র, কিছু জানত না। ঢুকে পড়ার পর বনের সর্বব্যাপী সত্তায় নিজেকে হারিয়ে ফেলছিল ও।

উলটকম্বল ঝোপ, গোয়ালকেঁড়ে লতার জাল দুলছে। কাঠবিড়ালি সরে সরে যায়। আশ্চর্য, কচি সবুজ শেওলা ঢাকা এ তো পথ একটি। এ-সব পথে কারা যেন যেত একদিন, পথ তাদের ভোলে নি। পায়ে চলা পথে এখন শেওলা নেই। ইন্দ্র আবিষ্টের মতো এগিয়ে চলে, এগিয়ে চলে, বনের ভিতর ঢুকে যায় ক্রমে, ঝোপঝাড় কেটে হাসিল জমিতে লাঙলের চিন। সোরেন। সোরেন মুখ তুলে তাকায়। গম্ভীর, জিজ্ঞেসু চোখ। দু জনে দু জনের দিকে চেয়ে থাকে, চেয়েই থাকে। সোরেনের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

অন্যরকম হাসি। হাসিতে চ্যালেঞ্জ আছে কি? ইন্দ্র চ্যালেঞ্জ চায় না। সোরেনের সঙ্গে কোনো শত্রুতা নেই, তার থাকতে পারে না। সোরেন জঙ্গলের গহীনে জমি হাসিল করতে পারে। কিন্তু সে একা। ইন্দ্রর পিছনে আছে এক মহতী সংগঠন, রাষ্ট্র, প্রশাসন, সমিতি। আর সেই জ্ঞান যা তাকে মদত দেয়। প্রত্যেকের রাজনীতি ভুল, আপসপন্থী অবিবেকী। একা ইন্দ্রবা নির্ভুল রাজনীতি করে। শুধু তারা থাকলেই হবে, আর সবাই ফালতু।

কিন্তু ইন্দ্রর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে খুব অদ্ভুত একটি কথা। ইন্দ্র বলে, বেড়া দাও নি কেন?

এখুন জমি খালি। ধান ছিটালে চারা বারানো হতে নজর রাখি লোক রবে হেথা।

তোমার জমি?

আমারদের।

সাঁওতালদের?

সবাকার।

কিন্তু—এ তো—ফরেস্টের জমি—

ফরেস গার্ড জানে। সি সানথাল। দুনো জনা।

ফরেস্টের জমি—

হাঁ, জরুর ফরেসের জমিন। গোরমেনের জমিন। সরকার সকল লিছে আমারদের। কিছু দিছে নাই, ভিখ মাঙল নাই জাহান কবুল। তাতেই ই জমিনটো হাসিল করি নিছি সকল জনে মিলি। হাসাটো, ই জমিনটো দেখছ? ধান দেয় কত। বাঁচায়ে রাখে।

এর চাল দিয়েই তা হলে…?

হাঁ ইন্দ্র।

আমাকে বল নি কেন?

তুমি সাচাই ছেলা। তুমার পথে কামটো করিতে চাহ, কিন্তুক ইন্দ্র! যা বলছ তাতে আগায়ে গিছি, যখুন ছিলে না তখুন ভি

অগোছি—কিন্তুক মনে কুনো ভরসা পাই নাই।

পাও নি?

পাই পাই, পাই না, পাব না। কথায় কামে মিল নাই, কিসের ভরসা? তুমি নিজে দেখছেন না? বর্গা রেকর্ডে মরতেছে ছুঁচা ইঁদুর জমিমালিক। বাঘ সিংহ যেমন কে তেমুন রহি গেল। খাস জমিন আছে, আমরা পাব নাই। তারা ভোগ করি যাবে। সকল বুঝি গ্রামে বসি গেলাম। হাঁ, গ্রামে রব। হব না পুলিশ। পুলিশ হয়ে আদিবাসী আর গ্রাম মানুষের উপর উঠাব না বন্দুক। বুকটো জ্বলি গিছিল।

তুমি কি সত্তরের দশকের রাজনীতিতে ফিরে যেতে চাও সোরেন? শেষ অবধি?

কে বলে? ফিরি পাছু হাঁটি না হে, সামনে আগাই।

এ তো জোর করে জঙ্গল দখল।

আগে দেখ নাই? নিজেরা কর নাই মানুষরে জমিন দিতে?

আগে বল নি কেন?

কারে বলব? কে বুঝবে? সাচাই হতে পার, কিন্তুক যা করতেছ তাতে কিছু হবার লয় হে। আমূল ধরি টান মারলে যদি কিছু হয়। সকল জমিন খালাস কর, স-কল জমিন্! যারাদের নাই, তারাদের বাটি দাও—করতে পার? পার না ইন্দ্র, পার না। তাতেই আমরা এই বেবস্থা করছি। জমিন্টো লক্ষ্মী। খরা আকালে ধান বাড়ি নিব না আর, মহাজনের ফাঁসে জড়াব না, ধান রাখি দিব ধর্মগোলায়—আরো জমি হাসিল করব, যেথা গাছ নাই, ঝোপ-জঙ্গল, সেথা যেয়ে পড়ব কোদাল দা লয়ে। খেসারি আর ধান আছে তো মানুষের মনে বল আছে। কিছু নাই যার, পেটে চাম নাই, হাড় জিরজিরা, সি মানুষ কতকাল বসি বসি টুপি পরতে পারে?

বর্গাদার তো শুধু নয়, খেতমজুরের জন্যেও লড়ব—

লত, মদত দিব। লড়ার মতো লড়ি সরকারি রেট আদায় করি দিবে ?

না, কেউ দিবে না। তুমার কথায় কি হবে ইন্দ্র, তুমার দাদারা আসি বলবে, রোতোনি সাউ আড়াই টাকা দেয়, তাই লাও হে। এক কাঠা মুড়ি লাও, আড়াই টাকা লাও। একবেলা পান্তা দেয় তো দু টাকা লাও। এখুন সহি যাও। তুমারদের দিন আসতেছে। দিন আসতেছে চিরকাল শুনি গেলাম। সাধে কি বসাই টুডু হাতিয়ারটো উঠাছিল ? বড় জ্বালায় উঠাছিল।

ফরেস্ট-এর জমি কি রাখতে দেবে ?

ই জমিতে হাত দিয়া দেখুক।

কি করবে সোরেন ? আবার সেই ভুল করবে ?

ঠিক পথ কুনটো ? তুমারদের পথ ? তেলা মাথে তেল গড়ায়, রুখা মাথা ফাটি যায়, ই তুমি ভি দেখতেছ, মানি লিবে না।

না, মানতে আমি পারি না।

না মানলা। এখুন কি করবে ?

কিচ্ছু করব না। তুমি কি কর দেখব, আমার কাজ করব।

সোরেন বিজয়ীর হাসি হাসে। বলে, সানতাল যাতে হাতিয়ার না ধরে তার লাগি কত প্রচার। সামাজটো মরি যায়, আমি হব পুলিশ ! তুমার পথে ইন্দ্র ! একাটা ধনী জোতমালিকের গায়ে কাঁটার ছড় গেলে পুলিশ আসি যায়। আর এখুনি ধান ফেলাবার আগে প্রচার দিতেছ, চাষকাম লই কুনো হাংনামা সরকার হতে দিবে না। হাংনামাটো একা জোতমালিকের হক, না ?

চিনতে পারে নি, চিনতে পারে নি সোরেনকে। ব্যর্থতার বোধ। সে বোধ থেকেই আরো কাছে এসেছিল ইন্দ্র, আরো। সোরেনের। সরকারি রেটে খেতমজুরি আদায়ের আন্দোলনে নামিয়েছিল কর্মীদের। হয় নি। যেমন হয় নি আগেও।

আর এরই মধ্যে বর্ষার জলে ধান রোয়ার মধ্যে মেতে উঠেছিল

নতুন উৎসবে। সিদু ও কানুর বিদ্রোহের স্মরণে ভরা বর্ষায় চরসা গ্রামে যে উৎসব হয়, জলে ভিজে ভিজে যাতে যোগ দেয় সাঁওতালরা মেয়ে-পুরুষে।

সামন্ত বলেছিল, কি দরকার ছিল? আগামী বছর সরকার থেকেই করা হবে।

তখন আমরা বড় উৎসব করব।

না। সরকারি অনুষ্ঠানই যথেষ্ট।

দেখা যাবে।

সামন্ত, নবীনবাবু ও মতিবাবুকে বলেছিল, বদলে যাচ্ছে, ভীষণ বদলে যাচ্ছে ইন্দ্র।

সেই জন্যেই দ্বৈপায়ন সরকারের সঙ্গে ইন্দ্রকে ভিড়িয়ে দেবার কথা মনে হয় সামন্তের।

যখন মনে হয়, তার আগেই কিন্তু বাস্তোনীর কাঠকালী মন্দিরের সেবাইত+পঞ্চায়েত প্রধান+এক ভালো মতো জমি-মালিক চড়ামণি পুতিতুণ্ড আর গৌরদের সঙ্গে প্রবল ঝগড়া লাগে। ইন্দ্রর কাছে আর্জি এসেছিল, অনেক আর্জি।

একটি নির্মীয়মাণ রাস্তাকে কেন্দ্র করে। বাস্তোনী-বাকুলি-সুড়া-গঞ্জরস্থল-খেজুরহাটা-তালহাটা-কদমখুঞ্জা। এ রাস্তা হলে সংযুক্ত হবে, হাটুরেদের সুবিধে সমধিক, তবে সবাই উপকৃত হবে। রাস্তাটি হোক, এ দাবি স্থানীয় মানুষের বহুদিনের। বহু আর্জি বহু বিধানসভা সদস্যের কাছে পড়েছে, লাভ হয় নি। বন্যার পর রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্ত হতে মানুষ দু হাত তুলে সরকারকে সাধুবাদ দিয়েছিল। আর রাস্তার কাজের উদ্বোধন করেন যে মন্ত্রী, তাঁকে জানিয়েছিল বিপুল সম্বর্ধনা। রাস্তার কাজ শুরু হতে গ্রামবাসীরা কাজের ভরসাও পায়। চূড়ামণি পুতিতুণ্ড, কাঠকালী মন্দিরের কারণেই দাপটশালী লোক। পুতিতুণ্ড বংশের স্বপ্নে প্রাপ্ত এই কাঠের কালীপ্রতিমা কেন যেন চালকুমড়ো বিনে পাঁঠা খান না।

তাঁর মন্দিরের প্রদীপে ধরে পাকি দশ সের তেল। সে তেল বাত-ব্যাধির ও সম্মোহনের মহৌষধ। বাত থাকলে বাত সারবে। কোনো পুরুষ বা নারী যে-কোনো পুরুষ বা নারীর সম্মোহনে পড়লে ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসবে। যেহেতু বাত ও সম্মোহন আরোগ্য ব্যবস্থা আছে, তা জেনেই যেন অঞ্চলের চারদিকে যত বাতের প্রকোপ, তত সম্মোহনের। চূড়ামণির আজকাল সময় হয় না। তার ছেলে ও ম্যাট্রিক পাস পুত্রবধূ দৈবী তেল দেয়, পয়সা নেয়, মায়েব দপ্তর দেখে। চূড়ামণি ঝাণ্ডা বদল করে পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছে '

বউ যদি বলে, মায়ের কামটা দেখ না কেনি ?

চূড়ামণি বলে, তুমি কি জানবে গ! এখুন যা কারি সি কাম ভি মা জুটায়ে দিছে। ভাবি নাই অ্যাত টাকা হাতে ধরব।

সরল ও শিশুপ্রাণ সরকার। চূড়ামণির মতো ঝাণ্ডা বদলানো কু-চক্করে জোতদার+সেবায়েতকে পঞ্চায়েত প্রধান করে এবং চূড়ামণির হাত দিয়ে অঞ্চল উন্নয়নী বিবিধ প্রকল্পের টাকা খরচ করা সাব্যস্ত করে। এর পিছনে কোনো মন্দ মনোভাব নেই। কালকের তেরঙ্গী আজকে লাল হয়েছে? হবে না কেন? হৃদপরিবর্তন ঘটেছে। এ তেরঙ্গীর যে নানা ভূমিকা গ্রামজীবনে, সে যে মহাজনও বটে, তার হাতে কাঁচা টাকা? তাতে কি হয়েছে? সে কি এখন পঞ্চায়েতের মাথা নয়?

চূড়ামণির হাত দিয়ে টাকা খরচ হচ্ছে, রাস্তা হচ্ছে, হঠাৎ রাস্তার কাজ বন্ধ। ইন্দ্রদের কাছে আর্জি। তখন সকাল দশটা হবে। বি ডি ও আপিস থেকে বীজ ধান কাকে কত দেয়া হয়েছে জানতে চেয়েছিল ইন্দ্র। আপিসের কেরানী কদমের হাতে 'আসাঢ় মাসে মাছের ভালো ফলনের জন্যে মাছের পোনার আঁতুড় পুকুর তৈরি', বিষয়ে কাগজ গছিয়ে দিয়েছে। জাগুলার মৎস্য বিভাগীয় অফিসার বি ডি ও আপিসের মাধ্যমে এগুলি প্রচার করাচ্ছেন এবং

নিজে বর্ষা নামার আগে 'মা তারা' স্পেশালে কেদারনাথ-বদ্রীনাথ ভ্রমণে গেছেন।

ইন্দ্র তাকে ধমকাচ্ছিল এবং একই সঙ্গে সরকারি প্রচারণার বাংলাভাষা দেখে ভিরমি খাচ্ছিল। তার সমস্যা ধান ও ধানচাষী। 'মাছের প্রণোদিত প্রজননে আগ্রহী মাছচাষী' নয়। তার ধারণা, মাছচাষীদের পুকুরে বিজ্ঞানসম্মত সার ব্যবহারে উদ্যোগী করা অসম্ভব। হারাণকে যেমন সরকার প্রদত্ত সার বিক্রির জন্যে নয়, ব্যবহারের জন্যে, বোঝানো অসম্ভব। ইন্দ্র বললে কি হবে? হারাণরা জানে যে সার বেচলে নগদ টাকা, সে যত কম দাম হোক না কেন—টাকা তো! আর হারাণরা এও জানে, যে একবার সরকারি সারের স্বাদ পেলে মাটি হবে রাক্ষুসি। সমানে ওই সার চাইবে। গোবর সারে কাজ হবে না। তার চেয়ে গোবর সার ভালো।

এরই মধ্যে ওরা শুনেছিল ডিম্‌ডিম্ শব্দ। ঢোলে মৃদু কাঠি দিতে দিতে কারা যেন আসছে। কারা? কি হল? চরসায় কিছু হল? কয়েকদিন যাওয়া হয় নি।

ডোম, সাঁওতাল, ক্যাওট, কাওরাদের জনা পঁচিশ লোক। সব বয়সের। সঙ্গে কয়েকটি ছেলে। গৌর, কদম, রজত, এরা চেনে। ছেলেগুলি শুধু তাদের দলের নয়, সকল রাজনীতিক দলের। রঙের। ওই ছেলেটি উগ্র রাজনীতির সমর্থক, এরা সবাই পার্টির, ওরা দু জন জীবনে বাম রাজনীতি করে নি। হঠাৎ সবাই মিলল কেন, কোন্ কারণে?

ছেলেগুলি এগিয়ে এল। আর্জি আছে। ভোজবাড়ির টেবিলে পাতার রোল কাগজে তা পাকানো আর্জি। দশ হাত লম্বা কাগজটির আগাগোড়া টিপ ছাপ, বয়ান উপরে লেখা সংক্ষিপ্ত।

চূড়ামণির বিভিন্ন অসৎ কাজের সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি। রাস্তার কাজ বন্ধ, আবার শুরু হবে। ভালো মতো বর্ষা নামার আগে

অবধি চলবে। আগে চূড়ামণির বিচার চাই। জাগুলায়, ব্লক আপিসে, সদর হাকিমকে বহু জানিয়ে লাভ হয় নি।

চূড়ামণি লোক রংরুট করছে সিকা সিকা পয়লা নিয়ে। যে হিসাবে দেখাচ্ছে সাতশো লোক খাটছে, আসলে খাটে তিনশো লোক। বাকি চারশো লোকের দিনমজুরি ও নিজে সরাচ্ছে, আগে যতদিন গম দেয়া হচ্ছিল, এ ভাবে সরিয়েছিল। চূড়ামণি সপ্তাহে একদিন ওদের মজুরি দেয় না, বলে সে টাকা মন্দির তহবিলে দিতে হবে। মজুরি দু টাকা। এ ভাবেও মাসে চব্বিশশো টাকা মারছে মজুরি মেরে, আর দিন চারশো লোকের মজুরির আটশো টাকা মাসে কোন্ হিসেবে দাঁড়ায়? চূড়ামণির এ কাজে সহায়ক কে কে? এ অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ চূড়ামণির বর্তমান সম্পত্তি, যা সে এক বছরে অর্জেছে। সম্পত্তি ঃ জাগুলা স্টেশনের সামনের সিনেমা ঘর, অন্য পথে চারটি বাস, জাগুলায় ভাড়াটে লরি দশটি। সব কিছুই বেনামে আছে। সিনেমা মালিকানী জয়কালী কোনো মানবী নয়, কাঠকালীর সঙ্গে পূজিতা জয়কালী দেবী। চারটি বাস যাদের নামে, তারা গতাসু বহুকাল আগে। লরির গ্যারেজ পুত্রবধূর বাপের নামে, যিনি মারা যাবার পর মেয়ের বিয়ে হয়। এর বিচার করতে হবে।

ইন্দ্রর দলের ছেলেরা বলে, ইজ্জতের লড়াই। সবাই এতে অংশীদার। বি ডি বাবু পুলিশচৌকি, সবাই।

সকলের সঙ্গে ইন্দ্রও গিয়েছিল। ক্রমে জনতা ভিড় করেছিল আর সুবিশাল সে জনতা ঘিরেছিল চূড়ামণিকে। চূড়ামণি প্রথমে চেঁচামেচি করে, কিন্তু ভীষণ রাগে ইন্দ্র ওকে শূন্যে তুলে ধরে ধপ করে মাটিতে নামায়। বলে সাধারণের সামনে বিচার তোমার, জবাব দাও।

দিব, দিব।

টাকার হিসাব, হিসাব দাও।

সব দিব।

টাকা মেরেছ ?

লিছি টাকা।

কত ?

এই সাত হাজার।

সাত হাজার ?

আবার ওকে শূন্যে তোলে ইন্দ্র এবং বাঁই বাঁই করে ঘোরায় কয়েকবার। এবার কেঁদে ফেলে চূড়ামণি, বলে, মেরো না হে! ওঃ! মাথাটো ঘুরাইছে কত, তা বাপ! তুমি লকশালী উঠালে কেনি ?

লকশালী উঠালে তুমার মাথাটো কুমড়া বলি হত, অ্যানেক হচ্ছে তখুন—কে বলে।

তা বটে, তা বটে কিন্তুক আলাপ-আলোচনা করি কথাটো ফার্সা হতে পারত, লয় ?

ইন্দ্র সগর্জনে বলে, চোরের সঙ্গে আলোচনা ?

এখন চূড়ামণি বলে, বেশ হেঁকে বলে, যত নিছি সব হিসাব নাই। তবে দিয়া দিব টাকা।

নেতাস্থানীয় ছেলেরা এগিয়ে আসে। চূড়ামণি পরদিন ব্যাংক থেকে এনে টাকা দিতে কবুল যায়। ইন্দ্র বলে, আজ এখানে থাকব কয়েকজন। কাল সঙ্গে নিয়ে ব্যাংকে যাব! ছেলেটাকেও নজরে রাখো।

বসে থাকে, বসে থাকে জনা তিরিশ। সামনে বসে থাকে চূড়ামণি ও তার ছেলে। ইন্দ্র বলে, পঞ্চায়েতে ইস্তফা দেবে, তোমার সিনেমা আর গ্যারেজ আমি বন্ধ করে ছাড়ব।

সময় যায়, সময় যায়। জমায়েত মানুষগুলি টাকা পাবে মজুরির, জেনে ক্রমে ফিরে যায়। প্রচুর গাল ও টিটকিরি দেয় চূড়ামণিকে। চূড়ামণি বলে, যা করলি তুরা, ইয়ার শোধ মা নিবে। দশদিন

চোরের, একদিন সাধুর, লিখা আছে।—ইন্দ্র ধমক মারে।

আর পুলিশ আসে। চূড়ামণির ম্যাট্রিক পাশ পুত্রবধূর কথা কেউ মাথায় রাখে নি। কোলের ছেলেকে শ্বাশুড়ির কাছে দিয়ে সে 'জয় মা কাঠকালী' বলে খিড়কির দোর দিয়ে দৌড় মেরেছিল। প্রথমে বি ডি আপিস। সেখানে সে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসেছিল। আপিসের কেরানী চূড়ামণির কৃপায় পাকা দালান তুলেছে ও হরিয়ানা ষাঁড় কিনেছে। সেই পুলিশচৌকিতে যায়।

পুলিশ এসেই বেমক্কা লাঠি চালায় ও মারতে থাকে। ফের মারে মরিয়া হয়ে ইন্দ্ররাও। গৌরের মাথা ফেটে রক্ত পড়ে, তাকে ধরতে গিয়ে ইন্দ্র ঘাড় ও মাথার সন্ধিতে খাঁড়ার কোপের মতো লাঠির কোপ খায়। সব অন্ধকার হয়ে আসে। তখন মাথায় লাঠি পড়ে। রক্ত।

পুলিশ ইন্দ্রকে ও গৌরকে হাসপাতালে নিয়েছিল। সকলকে থানায় নিয়ে প্রথমে পার্টির ছেলেদের ছেড়ে দিয়ে অন্যদের নামে কেস ফাঁদার সদিচ্ছা ছিল।

চূড়ামণি পুতিতুণ্ড গ্রামজীবনে এক অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। চূড়ামণিরা থাকে। ওরা সমাজব্যবস্থার থাম বিশেষ। রাজ আসে রাজ যায়, চূড়ামণির কিছু হয় না। চূড়ামণির চেয়ে অনেক আশংকা-জনক ঘটনা হল, ওর দুর্নীতির কারণে সকল দল ও মতের ছেলেদের এক হওয়া। অনেক ভয়ের ঘটনা হল, প্রশাসক দলের ছেলেদের নেতাদের ওপর অনাস্থা।

পার্টির ছেলেদের প্রবল চাপে সকলকে ছেড়ে দিতে হয় এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এক সামন্ত চূড়ামণিকে দিয়ে বকেয়া মজুরি দেওয়ায়। মজুরদের সংখ্যা থেকে চারশো নাম কাটা যাবে, অন্যান্য টাকা আদায় করা হবে, ইত্যাদি মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেয়। চূড়ামণি এখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যায়। ফলে সব থাকে চাপা। ছেলেরা বলে, রাস্তার কাজ চলবে, আমরা টাকা দেব।

সামন্ত খেঁকিয়ে বলে, তাই কর। কারা তোমাদের উসকানি দিচ্ছে, বিপথে নিচ্ছে, বুঝছ না তো?

আংশিক জয়। সেই চূড়ামণি রইল তার সম্পত্তি রইল, টাকার হিসেব দেওয়া মুলতুবি রইল—অথচ এ নাকি তাদের বিরাট জয়।

ইন্দ্র হাসপাতালে সবই শুনল। মনে অতৃপ্তি, অশান্তি, ক্ষোভ। কদম একদিন দেখা করে গেল বিষণ্ণ মুখে। তার বগলে 'ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প', বিশু নার্সারি অ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল ফার্ম প্রাইভেট লিমিটেড' ও 'কুমার ট্রাকটর কালটিভেটর'-এর অনেক বিজ্ঞাপন। নবীনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে গেলেই চাপিয়ে দিচ্ছে। তারপর দেখাল একটি সার্টিফিকেট। বিষণ্ণ গলায় বলল তার দুঃখের কাহিনী। কদমদের বাড়ির চালে এক রাক্কুসে কুমড়ো হয়েছিল। ডিংলাটি বিক্রি করতে এনেছিল ওর দাদা। ঘটনাচক্রে কদম সঙ্গে ছিল। দু জনে আগে যায় কৃষি প্রদর্শনীতে। ডিংলাটি নিয়ে নেয় মতিবাবু, প্রদর্শনীতে রাখে। ডিংলা গেছে পরবর্তী প্রদর্শনীতে, কদম একটি সার্টিফিকেট পেয়েছে। মা শুনলে খেপে যাবে। ছেলেকে পার্টিতে দিতে পারে, ডিংলা প্রদর্শনীতে দিলে চলে না। অত্যন্ত খারাপ সময় যাচ্ছে।

তারপর কদম বলল, সে এবং গৌর গ্রাম থেকে তরকারি এনে হাটে বেচবে। দেখবে পাইকাররা কি বজ্জাতি করে! তারপর নিজেরা সমবায় করে শহরে চালান দেবে।

সামনে কাজ নেই?

আর করবে না কদম, গৌরও করবে না। দীনু তো ডিমের ব্যবসা করবে। কি জন্যে করবে তারা? প্রাণপাত করে কাজ করলে পার্টির কাছে তার মূল্য কি? পার্টির ছেলে হয়ে ধান্দাবাজি যে করে করুক, তারা পারবে না।

আমি ফিরে যাই আগে।

হাঁ, তারপর কথা হবে।

কদম ওকে সলজ্জ ভাবে এক বাণ্ডিল বিড়ি ও তুটি বিস্কুট দিয়ে চলে যায়। যাবার আগে বলে যায়, মোরা ভি দাঁতে কামড় দিয়া আছি, ছাড়ি নাই। হাটে গঞ্জে সোহর দিতেছে দীনু, সোরেন— আমরা আছি সাথ সাথ। বলতেছি, কুনো গুণ নাই মন্দিরের তেলে—উ শুধা টাকা খিঁচা কৌশল। হাসপাতালে যাও, অষুদ পাবে। সোরেন তো বলতেছে, মন্দিরের তেলে যেমুন সকল গুণ আছে, তেমুন কুথা নাই ? তবে পুলিতুণ্ডব সবে শহবে ডাক্তারী অষুদ করে কেনি ? তাব পিসি কেনি বাপেরে বেথায় নুগ্গা ?

সোরেন এই সব করছে ?

হাঁ, করছে তো। আব বি ডি-ও-টা বদলি হল। আর কি বল তো ? দেখ! বড কথাটো ভুলি গিছি। সিদু-কানুর হল লড়াই লয়ে সোরেন খু—ব বড উৎসব করতে চায়। মোরাদের মদত লিবে। সিদু-কানুব মেলা ভি কববে। আর রোতোনির গমস্তা, পুলিতুণ্ডর ছেলা, সবে বলতেছে বসাই টুড় ফিন আসি যাবে। ডরো গিছে খুব।

কেন ? এ কথা বলছে কেন ?

কদম ঘাড় কাত করে ইন্দ্রর কপালটি দেখে। বলে, চূড়ামণিরে ঘিরছিলাম, সিদু-কানু ফাংশানটো করিবাব চাহি, তাতেই তুয়ে-তুয়ে চার জুড়তেছে। কপালে এখুনো বাঁধি রাখছে ? গুলি মারলে ডর নাই তখুন, এখুন কি হল ?

মাথা আর ঘাড় অনেক বিপজ্জনক।

কদম চলে যায়। গোরাবাবু বাইসাইকেল চেপে চলে আসে। ইন্দ্রর দিকে চেয়ে মনের উদ্বেগ জানাতে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, পুলিশগুলোকে বদলি করে দেয়া হয়েছে, জানো না তুমি। আর যে-সব ছেলেদের উস্কানিতে ভুল বুঝেছিলে, তাদের শাসিয়ে দেয়া হয়েছে।

ইন্দ্র চুপ করে থাকে।

আমাদের প্রতিটি পা ফেলতে হবে মেপে মেপে, বুঝে বুঝে। হঠকারী কাজ, যা সেদিন করেছিলে, তা কি আমরা করতে পারি? আমরা কি উগ্রপন্থী না কি?

ইন্দ্র কথা বলে না।

হাসপাতাল থেকে বেরোলেই আমরা আলোচনায় বসব। কেন না পার্টির নীতি-শৃঙ্খলার দিক থেকে—

ইন্দ্র যোগ করে, আত্মসমালোচনা এবং আচরণের মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একমাত্র সে ভাবেই কর্মী ও পার্টি এক হতে পারে।

এই তো, জান তুমি!

গোরা আলগা হয়ে বসে এবং খোলামেলা লোক বলে স্বীকার করে, এ কি আমার কাজ? নবীনদা নিজে এল না—

ইন্দ্র এবার চোখ বন্ধ করে এবং চুপ করে। গোরা আরো কিছুক্ষণ বকবক করে উঠে যায়। ইন্দ্র ঘুমিয়ে পড়ে।

পরের দিন আসে সোরেন, রতন এবং দীনুর মেসোমশায় সদানন্দ। রতন বলে, উঃ, কতো সিলাই সিলাছে, দাগ রয়ে যাবে। ই খুব খারাপ হই গেল।

ইন্দ্র হেসে ফেলে। বলে, দাগ থাকলে খারাপটা কি? আমি কি মেয়েছেলে, যে চেহারা খুঁতো হলে কাঁদব?

সোরেন ওর দিকে হাসিভরা মুখে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, উঠি পড় দেখি? হুল-এর ফাংশানটো লাগাই? পালা বাঁধিছে মোরাদের উদ্ধব, গান বাঁধি সুর দিছি আমি!

অভিনয় হবে?

গান হবে, নাচ হবে, অভিনয় হবে!

আমার শরীর যা হয়েছে—

ধুর! দশদিন শয্যা ধরি থাকলে দুবলা লাগে সবার।

তা ছাড়া তোমাদের সঙ্গে আমার—

আশমান-জমিন-ফারাক। চল দেখি?

যাব কি করে?

খালাস হবে কবে?

বোধহয় পরশু।

গরুর গাড়ি চাপায়ে লই যাব। লয়ে আসছি ত। খ্যাড় বেচি দিলাম। তা কম নয়, একশৎ দশ টাকার খ্যাড়!

মনে হচ্ছে কোথাও গিয়ে ঘুমোই।

এত কাম ফেলি? কাম আছে না তুমার।

রতন হঠাৎ বয়স্কতম লোকের ভূমিকায় নামে ও বলে, ধুর বাবু! কথায় কথা বাড়ি যায়, কামের কথায় চল কেনি? ইন্দর! তুমি ভরসা একটো, বিটিছেলার মতো কর কেনি? মজুরি আদয় লড়াইটো আছে। আর সোরেনের উপর কামরায় থাক, আরাম ভি পাবে। বাস্তোনীতে দেখবার কেও নাই তোমার। সেদিন বুঝি নাই। বাপরে চিনতাম—সি ছিল নিনু ভিতু মানুষ, সহজে ডরাত। তাতেই উচ্ছেদ করে রাম ভূঞার বাপ। তা যাবার ভি ঠাঁই কুথা তোমার? লাও হে উঠ তোমরা।

ইন্দ্র হঠাৎ মন স্থির করে। ওদের বলে না কিছু।

পরদিন, প্রায় ধমকাধমাকি করে বিলিজ নিয়ে ইন্দ্র রিকশা ধরে একটা। বহুদিন শুয়ে থাকার পর উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘুরবেই। ঘাড়ের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। সদানন্দর বাড়ি। ওকে নামতে দেখে ছুটে আসে রতন ও দীনু। ইন্দ্র বলে, ভাড়াটা দিয়ে দাও। গরুর গাড়ি কোথায়? আজই যাব।

গরুর গাড়িতে খড়ের উপর চট বিছানো বিছানায় শুয়ে চরসা ফেরা। সোরেনের বারান্দায় বসে চা খাওয়া। গৌর কদম ও রজত চলে আসে। সবাই মিলে ভাত খাওয়া। উপরে মাঠকোঠায় উঠতে উঠতে ইন্দ্র বলে, অনেক কথা আছে—এবং একটি কথাও না বলে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙতে গেলে জানালা দিয়ে চাইতে

আকাশটা দেখেছিল। শুনেছিল হরর হরর শব্দ। শুওর তাড়িয়ে ঘরে নিচ্ছে ওরা। নিচে সোরেন বলছিল, অক্ষর শিখতে গোঁফ বারাল সনা, তোর হরেক নাই।

শুনতে শুনতে ইন্দ্র আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। এত ঘুমের দরকার ওর শরীরে ছিল না কি?

পরদিন সকালে শরীর ঝরঝরে। গভীর কামারাদোরিতে সনার সঙ্গে চরসা তীরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন, শীর্ণ জলে মুখ ধোয়া। মুড়ি ও পেঁয়াজ খেতে খেতে নদীর ধার ধরে হাঁটা। সনা ওকে সাগ্রহে দেখায় ডোম পাড়ার ডোবাটি। বলে, সবে কাটছে, আমরা মাটি ফেলাছি, উ সন কাটতেছি, এখুন জল রয় খানিক।

এটা কি?

নদী কিনারে ডহর হবে গ।

ডহর?

সনার বাপ বলে, জলের কষ্ট খুব। নদী কিনারে ডহর কাটলে জল মিলতে পারে।

কুয়ো দরকার।

সি সবে জানে। মোরা পারি না কুয়া কাটতে। কুয়ার খরচ বেস্তর।

কুয়ো নেই, জল নেই। চরসার মতো কত গ্রাম আছে? প্রাচীন দীঘিগুলির সংস্কার করা হয় না কেন? সাতদীঘা গ্রামের ছয়টি দীঘিই হাজামজা, একটিতে তিরতিরে জল। নেই, জল নেই, তাই আকাশের জল চেয়ে পূজাপাট, জল ডাকা। সাতদীঘার একটি দীঘিতেও নাকি জল ওঠে নি। তখন দ্রোণ ডোম জল ডেকেছিল আর পাতাল থেকে উঠেছিল জল। সব গল্পে গ্রামীণ মানুষ আজও বিশ্বাস করে। প্রকৃতিনির্ভর করে দাও, অলৌকিকে বিশ্বাস থাকবে। বিজ্ঞাননির্ভর করে দাও অলৌকিকে বিশ্বাস থাকবে না। কে করবে? রতন বলে, ই সকল কার বেবস্থায় হতেছে? কার বেবস্থা?

সোরেন বলল, তুমি তোমার কাজ কর, আমি আমার। যি যার পথে থাকি, তবু দেখ কুথা মিলে।

হ্যাঁ সোরেন।

বল পাও টুনি?

একদিন নয়, প্রায় মুরগি খাওয়াচ্ছ কেন?

কলাই বেচি মুরগি কিনছিলাম সি বারে। ঘরে ঘরে দিছিলাম। যি যারটা পাল, ডিম বেচ মুরগ বেচ। আমি বেচি না কখুনো।

তবুও দরকার নেই।

এক পথে সকল ভুল, এক পথে সকল ঠিক, মানি নিতাম কামটো দেখতাম যেমুন। কামের পাত্তা নাই, জমিন মালিক আর পুলিশ—দুই যমে নিস্তার নাই, এত দেখি তবে ভাবলাম নিজেরা বাঁচার আসানীটো করতে হবে, লয়তো মরি যাব।

বুঝেছি, কিন্তু—

হাতিয়ারটো ধরব কি না? ধরালে ধরি। সিদিন পুতিতুণ্ডের ঘরে মারছিল পুলিশ। হাতে লাঠি থাকত যেমুন? মারতে না? শুধা হাতেই তো বাঘঝাঁপ দিছিলা।

তখন কি আর যুক্তিবুদ্ধি থাকে? রাগ থাকে।

তবে বুঝ?

তোমার ফাংশানের তোড়জোড় কোথায়?

খানিক জল লামুক, রোপাইটো হই যাক? তখুন সকালের সময় মিলে, সময়েব কাম। ছুলের কথা জানতম না ভাল। পড়াতে জানতে সময় নিলম।

কয়েকদিন পরে সামন্ত ইন্দ্রকে ডাকে। ইন্দ্র গেলে পরে সে প্রথমেই বলে, সোরেনের সঙ্গে মিশছ, কতটুকু জান ওকে? আমি চাই না কোন কারণে সাঁওতালরা নিজেরা কোন প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে ওঠে। অত্যন্ত জটিল ব্যাপার এ-সব।

দ্বৈপায়নের সঙ্গে ইন্দ্রব যোগাযোগ তখনি।

দ্বৈপায়ন সরকারের কথা শুনে সোরেনের চোখ দুর্বোধ্য হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, কিছু আছে কথা।

কি হতে পারে ?

জানি না। আদিবাসীতে বহোত মন দিতেছে দেখলে এখুন ডরাই। সরকারি আদিবাসী দপ্তরের লোক নয় ?

না। অন্য পার্টির লোক।

মিশনারি চিনি, রাজা বাবুরে চিনি, ই জনা অচিনা। তুমি বল, চরসা-বাকুলি-কদমখুঞা যেতে নিষেধ ?

হ্যাঁ।—ইন্দ্ররও সংশয় হচ্ছিল, অস্বস্তি।

লকশালী লয়ে যারা মাথা ঘামায়ে বই লিখে ইংরাজিতে তারা ভি ই সকল গাঁ-গেরাম ঘুরে গিছে।

এ তা ঘুরবে না।

দেখ, বার করি লও কথাটো। আর, একটো কথা—মোরাদের ফাংশানে এক কথা আনছে বাকুলীর সানথালরা। বসাই টুডুরে লয়ে যত গান বাঁধছে তা ভি বলথে হবে। বলে, সি ভি সানথাল, আর সিদো-কানহুর লড়াইটো লতুন করি সি দেখায়ে গিছে। তার লামটো করতে হবে।

এসব আমি বুঝি না।

আমি মীমাংসা করছি এক ভাবে।

কি করলে ?

সবার আগে রাখব বাবা তিলকা মাঝির কথা। কমজনা জানে, কিন্তুক পহেলা লড়াইটো তিনি উঠাছিল ইংরাজের সাথে। হঁা! সিদো-কানহুর লড়াই হতে সত্তর বৎসর আগে। তা বাদে বলব সিদো-কানহু-চাঁদো-ভৈরবের হুল—তাহার কথা। তা বাদে মালদহের জিতা সানথালের লড়াই—তা বাদে তেভাগা লড়াইয়ে যত সানথাল শহীদ হছে, তারাদেব কথা—তা বাদে সবাই টুডুর কথা—আর লকশালীতে মরছে যারা তারাদের কথা—সকলকার

কথা জুড়ি পালার আগে বন্দনা গাহি দিব।

ইন্দ্র গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, এ-সব কথা সকলকে বোলো না যেন। বললে গোলমাল।

তাই বলি?

এ লোকটাকে নিয়ে এমন সময়ে আটকে গেলাম!

সামন্তবাবু কি জানবে? লিয়ে এস কেনি?

ঝিরঝিরে বৃষ্টি, ঝমঝমে বৃষ্টির দিন আসে হঠাৎ। রুক্ষ লাল প্রান্তরে সবুজ ঘাসের মাথা জাগে। বৃষ্টি থামলে পাখির ঝাঁক নামে পোকামাকড় ধরে খাবে বলে। কদমদের ঘরের চালে আবার ফলে মস্ত কুমড়ো। রোপাই চলে দ্রুত হাতে। বীজতলা থেকে ধানের চারা মাঠে মাঠে রোয়া বা রোপাই বা ধান নাড়া মানে খেতমজুর, নামাল, দাওয়াল। তার মনে খেতমজুরি আদায়ের আন্দোলন। ইন্দ্রর দুঃখ হয় থাকছে না বলে। সামন্ত, নবীনবাবু, মতিবাবু চায় না সে থাকুক—তাও বোঝে। চূড়ামণি পুতিতুণ্ডের ঘটনা। দীনু ও রজত বলে যায়, নিশ্চিন্তে চলে যাক ইন্দ্র। ক্ষেতমজুরির ব্যাপারে তারা লড়ে যাবে, মৌল এই ইস্যুতে মিলাবে সেই ভিন্ন দলীয় ছেলেগুলিকে। ছেলেগুলো তো ভালো, নইলে চূড়ামণির সঙ্গে লড়াই বাধানোতে ওরা আসত কি? ওদের নেই দল বা সংগঠন। কাজের মধ্যে ওদের সঙ্গে মিলিত হতে হবে। অপদার্থ ও সুবিধাবাদী নেতৃত্বের সমান্তরালে গড়তে হবে শক্ত কেজোকর্মা সংগঠন। ইন্দ্র ভাবছে কেন এত?

যাবার আগে ইন্দ্র নবীনবাবুকে বলল, বসাই টুডুর আন্দোলনের গ্রামে আপনারা অন্যদের ঘুরতে দিয়েছেন। এ ভদ্রলোকের বেলা অন্য গ্রাম দেখাচ্ছেন কেন?

জানি না ইন্দ্র, জানি না।

কে এ লোক? পীর না পয়গম্বর?

জানি না।

হঠাৎ আমার ঘাড়ে কোপ কেন? আমি কি সব গ্রাম চিনি নাকি? যারা জানে, তারা গেল না কেন?

জানি না। গোরা যাবে।

গোরাবাবু? সদর ছেড়ে?

গোরা বলল, নিশ্চয়। তুমি হচ্ছ আমার নিচে। মানে, জ্ঞান কম এখনো। আমার সঙ্গে ঘুরলে তোমার শিক্ষাও হবে। চাষ কাজ চলছে, নইলে, মক্কেলকে ওদের উৎসব দেখিয়ে দিতাম।

দ্বৈপায়ন বলল, উৎসব আমি অনেক দেখেছি। এখন উৎসবের নাচ-গানও যেন জমাতে পারে না।

গোরা বলল, সে রকম নাচ আর এখন হয় না। কেন হয় না কে জানে? সব অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে নাকি?

ইন্দ্র বজ্জাতি করে বলল, বোধহয় খেতে পায় না বলে।

গোরা বলল, ঠিক বলেছ।

দ্বৈপায়ন একটি ছোট বক্তৃতা দিল। খেতে পাক বা না পাক, নাচের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। সাঁওতাল এবং অন্য আদিবাসীরা নাচে জীবনের আনন্দে। জীবনের আনন্দ এমন এক জিনিস, যার সঙ্গে পেটের খিদের কোন যোগ নেই।

গোরা ভোঁদাগোবিন্দ লোক। সে তেতে বলল, বটে। পেটের ভাতের সঙ্গে যোগ নেই?

না। এ-সব কথা বিদেশী বিশেষজ্ঞরা জানেন।

খেতে না পেলেও 'বাবু আঁইচে গ' বলে নাচতে হবে?

দ্বৈপায়ন তাচ্ছিল্যভরে হাসল, কথা বলল না।

খিদের জন্যে নষ্ট হচ্ছে না, বেশ! তাহলে জীবনের আনন্দটা ওদের নষ্ট হচ্ছে কি জন্যে?

দ্বৈপায়ন ক্লিষ্ট, পরম ধৈর্যের হাসি হাসে। দ্বিতীয় বক্তৃতা দেয়। ওদের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা জাগানো, ওদের মধ্যে অ-আদিবাসী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন, এগুলো ঠিক নয়। তাতে ওদের

মৌলিক আদিবাসীত্ব নষ্ট হয়ে যায়। যেমন হচ্ছে পোশাকে, কথায়।

গোরা আরো তেতে ওঠে ও জীপের সীটে ছিটকে উঠে বলে, এটা কী রকম কথা হল ?

অত্যধিক রাজনীতিক চেতনা থেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদ আসছে। এ তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ইন্দ্র বজ্জাতি করে বলে, পোশাক আর কথা পালটাবে না ? লেখাপড়া শিখলে, কাজকর্ম করলে, সে জগতের ছাপ পড়বে না ?

দ্বৈপায়ন ককিয়ে ওঠে প্রায়। না না, তেমন আদিবাসীদের ওর কৃত্রিম কৃত্রিম লাগে।

ইন্দ্র আবার বলে, করে আপনি গবেষণা করবেন, জীপে চেপে গ্রামে যাবেন বলে ওরা লেখাপড়া না শিখে, কাজকর্ম না করে, খাটো কাপড় পরে নেচে চলবে—তা কি হয় ?

তা কেন ! দ্বৈপায়ন এই অজ্ঞ বালককে আলোকদান করে। ওরা নিজেরাই বুঝবে সেই ওদের প্রকৃত রূপ।

কে বলেছে ? কোন ভগবান ?

বহু, বহুজন। এ নিয়ে কম কাজ হচ্ছে ?

রাজনীতিক চেতনা তো খুব বলছেন,—গোরা আবার তেতে ওঠে, জানেন ওরা হূল করেছিল ? করে নি ? তা নিয়ে ফাংশানও হবে, কী রকম হয় তা দেখবেন।

অন্যরা না শেখালে ওরা হূল জাতীয় লড়াই করবে। অপূর্ব। তীর আর ধনুক। লাল কাঁকরের মাঠে কালো মানুষের ভিড়! কিন্তু সে লড়াই করা যে ভুল তাও বুঝবে। কেন না বন্দুকের মুখে কি তীর দাঁড়াতে পারে ? করুক না নিজেরা।

গোরা এখন, খানিকটা নির্বোধ ও সরল বলেই বলে ফেলে, ছাই বুঝেছেন। জানেন না তো বসাই টুডুর কথা ? কয়েকটা বছর ধরে কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

তাতে লাভ হয়েছে কোনো ?

গোরাকে টেপে ইন্দ্র। গোরা বলে, না না, লাভ হবে কি ? হিংসা তো ভালো নয়। তাই আমরা শেখাচ্ছি।

বসাই টুডুর কথা আমি জানি।

যাক্ গে।

গোরা গভীর অস্বস্তিতে চুপ করে। বাকুলি পিছনে রেখে সুড়া গ্রাম আসে কাছে। গোরা বলে, এ-সব জায়গায় ডাকবাংলা হবে ভাবি নি কখনো। স—ব সেই বসাইয়ের লড়াইয়ের পর হয়।— ধুর! ফের সেই বসাইয়ের কথা বলছি।

অত্যন্ত ছোটো ডাকবাংলা। দুই কামরার ঘর, দু'পাশে বাথরুম। বাংলার চৌহদ্দি উঁচু কাঁটাতারে ঘেরা। ভিতরের জমিতে কুমড়ো, লঙ্কা ও ঝিঙে গাছ। বাংলার সংলগ্ন একখানা ঘরে গ্রাম চৌকিদার থাকার ব্যবস্থা। গোরা আগেই সব জানিয়ে রেখে থাকবে। গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক, তালগুড় ব্যবসায়ী ও মুদি দোকানের মালিক শশী হাজরা বারান্দায় বসেছিল। গোরাকে দেখে সে বলে, চা এখানে হবে। ভাত আমি পাঠিয়ে দেব।

কি পেলে ? মাছ না মুরগি ?

আপনি বলে কথা। পাঁঠাই কাটলাম একটা। নেন, ঘর-টর সাফ করিয়ে রেখেছি। টর্চ আছে তো ? সাপ বেরোচ্ছে খুব।

তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

জলখাবারটা দেখিগে—এ তো জাগুলা নয়, মিলে না কিছু! রাস্তাটা পাকা হলে, হাঁ!

দ্বৈপায়ন বলে, গ্রামের জিনিস বাইরে চলে যাবে না পাকা রাস্তা হলে ? সেও তো হবে তখন।

দেরি আছে সার। 'ডাইনির হাতে পো'। চূড়ামণির তদারকিতে রাস্তা! সুরকি ঢেলে পিটাই করবে, তার বায়নাক্কা কত!

সাঁওতাল, মানে মাঝি পাড়ায় নিয়ে যেতে হবে এনাকে। কালই যেন হয়। এখন তো তোমার ছাত্ররা মাঠে নেমেছে।

আর মাঝিপাড়া! তাদের ছেলেরা আসছে কত এখন। আবার খেজুরহাটার পবন কিসকু বড়দের শিখাচ্ছে পড়তে। খুব মেতেছে এখন। ঘরে ধান আছে, পনেরো বিঘায় ভালো চাষ, জলকষ্ট নেই। এখন ওই নিয়ে মেতেছে।

গোরা হাসে ও বলে, পবন কিসকু ছিল কালীদার কাগজের সংবাদদাতা। তবে হ্যাঁ, সাঁওতাল প্রধান গ্রাম যেমন, পঞ্চায়েতের মাথা ও হয়েছে, আর কাজও করছে।

শশী হাজরা তেতে উঠে বলে, তার টেঁকে অস্থির আমরা। সে নিজে ছেলেদের নিয়ে খন্দ উঠায় আর খেতমজুরি উঠিয়ে দিচ্ছে সাত টাকায়। সাত টাকা দিব, মুড়ি পিঁয়াজ দিব, অত পারি নাকি?

তাই নাকি?

পুলিশ চৌকিতে ঝগড়া করে এসেছে।

কেন?

রানী মেঝেনকে কোনো পুলিশ টিটকিরি দিয়েছে।

পুলিশগুলো বড় খচ্চর।

বাপরে, সে পবনের কথা কত! মেয়েছেলে নিয়ে বদমাশি করলে সব নাকি জলে যাবে। ওর কথা নয়, এখন কিন্তু একটা কথা খুব শুনছি। বুঝি না।

কি?

বসাই টুডু ফিরে আসবে, গিরা পাঠাবে আগে।

না না, বাজে গুজব!

গুজব হলেই ভালো।

দ্বৈপায়ন হঠাৎ বলে, বসাই টুডু? গিরা?

শশী হাজরা বলে, আমি চলি দাদা।

শশীর বাড়ি থেকে আসে আটার পরোটা ও তিল-গুড়ের চাকি।

দ্বৈপায়ন স্বয়ম্ভর লোক। সে ভালো ঘরটি গুছিয়ে নেয়, মশারি খাটায়, কচ্ছপ ধূপ জ্বালে। শশীর বাড়ি থেকে মশারি, বালিশ, তোশক ও চাদর আসে গোরা ও ইন্দ্রর জন্যে। গোরা বলে, শশী সব রাখে।

সন্ধ্যায় দ্বৈপায়ন নিজের ঘরে বসে ব্যাটারিচালিত টেপরেকর্ডার পরখ করছিল। ইন্দ্র টর্চ নিয়ে বেরিয়ে খানিক হাঁটার চেষ্টা করে ফিরে এসেছিল। ফেরার পথে ওর সঙ্গে দেখা হয় শশীর বালক চাকরের। সে বলে, ঘর চলেন আজ্ঞা। পথ ভালো নয় এখুন।

সাপ?

হাঁ মাশায়। খুব। দু দিন জল পেয়ে বেরাইঁচে সব। খুব ভয় ভীত হয়ে যেঁইচে ইবার।

সাপ কাটলে তো তোকেও কাটবে।

উনার কাটা তো লেখা কপালের আজ্ঞা।

তুই শশীবাবুর চাকর?

বারমাসিয়া আজ্ঞা।

স্কুলে পড়িস না?

যেতম আগে।

তারপর?

বাবা মর্যে গেল, আমি বারমাসিয়া হলম।

কোথায় যাচ্ছিলি?

ঘরকে!

দূরে?

কোথাক।

খাস শশীবাবুর বাড়ি?

হাঁ হাঁ। রাত লাগলে ঘর যাই।

ইন্দ্রকে পৌঁছে দিয়ে চলে যায় ছেলেটা। অন্ধকারেই যায়। এঁদের বিশ্বাস 'নরে নাগে বাস' চিরকালের। সাপ কামড়ালে

বলে, 'সাপের লেখা আর বাঘের দেখা।' বিজ্ঞানকেন্দ্রিক আধুনিক জীবন, সচ্ছলতা, এই নিয়তিবাদিতা কেটে যেতে থাকবে ক্রমে। হাতে টর্চ জ্বলবে—পায়ে থাকবে জুতো—সর্পচিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে হাতের কাছে। গ্রামীণ জীবনের কোষে কোষে ক্যানসার সংক্রমণ। বারোমাস ধরে শশীবাবুদের দিনরাতের গোলাম থাকে ছেলেটার বাবারা—মরে গেলে ছেলেরা স্কুল ছেড়ে বারোমাসিয়া হয়। 'বনডেড লেবার সিসটেম (অ্যাবলিশন) অর্ডিনান্স ১৯৭৫' দ্বারা কৃষি ও ঋণ দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হতে পারে। সে আইনে দাসদের রাজ্যওয়ারি নামের মধ্যে 'বারোমাসিয়া' নামটি থাকতে পারে। তাতে এসে যায় না দাসরক্ষকদের, রাজনীতিক দলগুলির। পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে চলে সাংবিধানিক প্রগতির পথে অন্যান্য ক্যানসারসহ দাসপ্রথা সঙ্গে নিয়ে। 'জিলাবার্তা' কাগজে কালী সাঁতরার জেলাওয়ারি বারোমাসিয়া প্রথার পরিসংখ্যান সারণি। পার্টির পাগলাখ্যাঁচা নিঃসঙ্গ মানুষ। নিহত বা নিরুদ্দেশ, এখন সে ছবি থানার দেওয়ালে। তুমি কি কেবলি ছবি থানাগাত্রে লিখা?

ইন্দ্র যখন ফেরে, ততক্ষণে দ্বৈপায়ন স্নান সেরেছে কুয়োর জলে, কফি বানিয়ে নিয়েছে এক পেয়ালা। গোরা কফি খায় না। বুর্জোয়া বিলাসে গোরা নেই। ইন্দ্র ঢুকতেই দ্বৈপায়ন বলে, বস ভাই, একটু আস্তে। খাটটা মচমচে। কাল সকাল থেকেই আমরা কাজ শুরু করব।

গোরা বাবু?

শশী হাজরার বাড়ি গেছে।

চৌকিদার?

ঘরে গেছে নিশ্চয়।

ভালো।

ইন্দ্র কপাটের দু দিকে হাত রেখে দাঁড়ায় ও বলে, আপনার রিসার্চটা কি?

কেন বল তো ?

আপনার সঙ্গে ঘুরব দিনের পর দিন, কার সঙ্গে ঘুরছি, কেন ঘুরছি তা জানতে হবে না ? সাঁওতাল গ্রামে গ্রামে ঘুরবেন, অথচ যেখানে সেদিনও এত কাণ্ড হয়েছে, সেখানে যাবেন না—

কে বলল যাব না ?

যাবেন ?

যেখানে গেলে কাজ হবে সেখানে যাব।

কি ব্যাপারে যাচ্ছেন ?

সাঁওতাল সমাজ সম্পর্কে নতুন সমীক্ষা করতে।

সমীক্ষা ! দেখুন, আমি কাজ করা ছেলে, এ-সব গবেষণা-টবেষণা বুঝি না, বুঝতে চাই না। কোনো চারশো বিশ নেই তো ? শেষে আলতুফালতু লিখবেন না তো ?

না, সত্যি কথাই লিখব। কি লিখবেন ? না হয় বললেনই আমাকে। আমি তো অজ্ঞ মানুষ, ওদের মধ্যেও কাজ করব। আপনি চলে যাবেন কাজ সেরে। তখন জানতে পারব না আর।

দ্বৈপায়ন ধূসর চোখে চায়। বলে, বলব। গভীর বিরক্তিতে ইন্দ্র দ্বৈপায়নের নাইলনের মশারি ও বিদেশী ঘুমোবার সাজ-সরঞ্জাম দেখে। নরম, দুর্মূল্য সিল্ক-নাইলন দিয়ে দিয়ে তৈরি স্লিপিং ব্যাগ, ভেতরে কিসের প্যাডিং ? ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, নাইলন পাজামা, —লোকটাকে ধানরোপাই কাজে ফেলে দিলে কেমন হয় ?

শশী এবং গোরা ফিরে আসে। দু জনের হাতে বড় গামছায় বাঁধা ডেকচি। মাংসের সুঘ্রাণ। শশী বলে, চৌকিদার এসে জল দেবে, আমি যাচ্ছি।

বেজায় ঝাল মাংস, খুব সুস্বাদ চাল, তেঁতুলের থকথকে চাটনি, বেগুন ভাজা। ইন্দ্র অসম্ভব খায় এবং মেঝেতে শুয়ে পড়ে শতরঞ্চিতে—মশারিটা মুড়ি দিয়ে। ঘুমিয়েও পড়ে।

সুড়ার মাঝিপাড়ায় লোকজনকে পেতে পেতে পরদিন সন্ধ্যা।

দিনে সবাই ধানরোপাই করতে, রাস্তা কাটা মাটি সরাতে ব্যস্ত। শশীর স্কুলে দাওয়ার ঝোলে হ্যাজাক, কয়েকটি চেয়ার। সামনে কয়েকটি ব্যঞ্জনাহীন, নীরব, কালো কালো মুখ। দ্বৈপায়ন বলে, এ ভাবে কি কথা হয়? একজনকে সামনে ডাকুন।

মাধব উঠে আসে, মাধব হাঁসদা। দেখে বোঝা যায় এ রকম সে আগেও এসেছে, আগেও কথা বলেছে। টেপরেকর্ডার চালু করে দেয় দ্বৈপায়ন ও কথা শুরু করে।

কতজন আছে তারা গ্রামে? কতজন লেখাপড়া শিখছে? লেখাপড়া শেখাবার উদ্দেশ্য কি? মেয়েরা কি লেখাপড়া শেখে?

মাধব সাধ্যমতো জবাব দেয়। পরিষ্কার কথা, ইতস্তত বা আমতা-আমতা করে না।

নিজেদের হকের জন্যে কি করে তারা? লড়াই করে কি?

পবন কিসকু বলতে পারে।

এখানে নকশাল আন্দোলন হয়েছিল?

মাধব জানে না।

তোমরা তো সে আন্দোলনে যাও নি। আমার কাছে খবর আছে। কেন যাও নি? কেন?

মাধব অত্যন্ত চকিত ও সতর্ক হয়ে তাকায়। কথা বলে না। এখন ওর চোখ অন্যরকম, ও বুঝতে চেষ্টা করছে।

বসাই টুডুর আন্দোলনেও তো যাও নি। কেন?

মাধব হাত তোলে। নিরন্ন খেতমজুর আন্দাজে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ গলায় শশীকে বলে, সি বার যারে আনছিল, সি শুধায় তুমরা কেনি বসায়ের সাথ গিছিলা। নকশালীটো উঠাছিলা কেনি? ই বাবু বলে, তুমরা নকশালীটো কর নাই। বসায়ের সাথ যাও নাই কেনি? ই তুমি কি করতেছ? যাও যাও ছিঁড়া কথার জবাব নাই।

শশী বলে, আরে—ইনি তো শুধোচ্ছে শুধু।

মাধব বলে, হ্যাচাক জ্বালি চেয়ার পাতি এত কথার জবাব হয়

না বাবু। আমারদের কুনো কথা নাই শশীবাবু সমিতির মাথাটো হচ্ছে। আমারদের আধা মজুরি দিতে কোঁক কাটে—উয়ারে শুধাও। তুমি বল, শশীবাবু।

মাধব বলে, চল চল ঘর চল সবে।

ওরা চলে যায়। দ্বৈপায়ন বলে, কি হল? কিছু বুঝলাম না তো? এরা তো আন্দোলন করে নি।

শশী বলে, টুডুর নাম করে বসলেন। একে ওরা বিশ্বাস করে না। কাউকে আমাদের!

পবন কিসকু খেজুরহাটায় আছে?

হ্যাঁ, চলুন, ফিরি।

সেখানেই চলুন কাল।

পরদিন ওরা খেজুরহাটা রওনা হয় এবং ওদের খেজুরহাটায় পৌঁছে দিয়ে গোরা ইন্দ্রকে বলেন, আমি জীপ নিয়ে চললাম জাগুলা। ভূঞার জীপ, তার ড্রাইভার নিয়ে আসবে আবার।

কেন?

ইন্দ্র! আমি কি করব ওর সঙ্গে ঘুরে? কোত্থেকে কি করতে এসেছে কে জানে। সদরে আমারও কাজ আছে।

দ্বৈপায়ন বলে, জীপ চাই না।

চাই না?

না।

ফিরবেন কি করে?

আমার হেঁটে, গরুর গাড়ি চেপে অভ্যেস আছে।

ভালো, চলুন ভজিয়ে দিয়ে যাই।

কোথায়।

সমিতির আপিসে। বৈরাগী সর্দারের বাড়িতেই আপিস, ওই সেক্রেটারি। বৈরাগীকে পেলে হয়। ধান রোপাইয়ের সময়ে সে লোক গ্রামে থাকবে? মনে হয় না।

মাটির একখানা চৌচালা ঘরের একদিকে বৈরাগীর ঘর সংসার। বেড়ার দেওয়ালের অন্যদিকে সমিতি আপিস। খবর দেওয়া ছিল, তারিখ দেওয়া হয় নি। বৈরাগীর ছেলে ওদের সমিতির ঘর খুলে দেয় ও ছাগল নিয়ে চলে যায়। মেঝেতে চাটাই, কোণে একটি তোরঙ্গ। কাগজপত্র থাকে বোধ হয়। ইন্দ্র ও দ্বৈপায়ন চাটাইয়ে রাখে সব। বৈরাগীর বউ মাথায় এক বোঝা কাঠ নিয়ে ঢোকে। উঠোনে ফেলে এবং ওদের দেখে বলে, ঘরে নাই। কোথা বা গিছে।

ইন্দ্র বলে, ঠিক আছে।

বউটি রুগ্ন মতো। শীর্ণ গলায় বলে। হোই ইন্দারা, জল আছে। নাহাও আপনারা, ভাত বসাই আমি। চা করি?

লোক আসে যায় নিশ্চয়। চায়ের ব্যবস্থা থেকে বোঝা যায়। গুড়-চা, তাতে আদাব রস, দুধ নেই। ইন্দ্র রান্নার জল তুলে দেয়। কাঠ চেলিয়ে দেয় কিছু। বউটি অকুণ্ঠে গ্রহণ করে সাহায্য। তারপর বলে, ভাত আর পুস্ত। আর কিছু নাই।

সেই অনেক।

জনা জনা কত দিতে চায়। সে নেয় না কিছু।

বৈরাগী এসে পড়ে বিকেলে। দ্বৈপায়নকে দেখে সে ঘাবড়ে যায়! ইন্দ্রকে বলে। পবনের ঘর আছে একটা। নূতন উঠাচ্ছে ইবার। সেথা চলেন আপনারা।

না। এতেই হবে।

দ্বৈপায়নের অসুবিধে হচ্ছে বুঝে ইন্দ্র অপরিসীম আনন্দ পায়। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাঁশঝাড়, যে-কোনো, পগার। দ্বৈপায়ন শহীদের মতো মুখ করে বলে, পগার?

খাত কাটলে, খানা কাটলে পগার বলে।

বৈরাগী বলে, পগারের সুবিধা কত। গুয়ের কাঁড়ি হলে মাটিতে বুজাব, সার মজাব, তারপর যা খন্দ করি তাই অসাগর ফলে। বুঝত না কেউ, তা আমি বলি, মজলে মাটি, ময়লা কোথা? এর

মতো সার নাই।

ইন্দ্র বলে, চলে যান, নইলে চেপে থাকুন জাগুলা ফেরা পর্যন্ত।

সাপ নেই তো?

তা হেলে ঢ্যামনা তো থাকবেই।

চলে যায় দ্বৈপায়ন, এবং খুব তাড়াতাড়ি ফেরে। বৈরাগীর গরিব সমিতির ঘর। দুপুরে ভাত ও পোস্ত বাটা, মলত্যাগের জন্যে পগার, হেলে ও ঢ্যামনা বা দাঁড়াস সাপের সম্ভাবনা—গ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাকে বা গ্রামকে সাহায্য করছে বলে মনে হয় না। ইন্দ্র পরম আনন্দে বলে, জীপ আসছে না আর। এঁটেল কাদা কাঁকর মাটি, আছাড় খেতে খেতে হাঁটতে হবে। এখন বুঝলেন, গ্রামের সঙ্গে পরিচয় হবে আপনার।

তারপর ইন্দ্র বলে, বলুন তো, কি জন্যে এসেছেন?

বলব, বলব।

পবনের বাড়ি সন্ধ্যায়, পবন কিসকু। স্বজাতি অনুপাতে ধনী লোক। পনেরো বিঘা জমির মালিক। দেখে বোঝা যায় ওর ওজন আছে। ওর ঝকঝকে আঙিনায় শুওরের খোঁয়াড়। গরুর গোয়াল। দাওয়ায় ব্ল্যাকবোর্ড, তাকে চটি চটি বই। ঠিক সন্ধ্যের মুখে পবনের বউ-মা-মেয়ে মাছ ধরে ফেরে খাল থেকে। পবন রাজনীতিক পার্টি করে না।

ইন্দ্রর নাম শুনেই চিনল পবন। বলল চূড়ামণির সাথ হাংনামা করবে। তা শুধা হাতে যায়? থানা পুলুশে—উয়াতে মাগভাতার হই আছে সি নকশালী সময় হতে। একটা বন্দুক ছিনায়ে নিছিল তারা, এখুন উয়ার তিনটা বন্দুক, দনাদন চালায়। ই বাবু কে?

এঁর জন্যেই আসা।

বইটো লিখবে?

দ্বৈপায়ন বলে। না না। —চারদিকে চেয়ে দেখে বলে। তুমি তো লেখাপড়া শেখাচ্ছ। কাদের?

যি আসে, তারে।

কোনো সরকারি প্রোগ্রামে ?

না।

তবে ?

পঢ়াইটো শিখুক। বই-কিতাব পঢ়ি জানুক। জানে না কিছু। তাতেই মরি যায়।

জানলে ?

আমারদের হকটো জানি যাক। সরকার যা দিচ্ছে তা ভি জানে না। হল লকশালী, তা বাদে বসাই উঠাল লঢ়াই,—পরতাপ কুডার বেনাম দখল খাস জমি কানুনগোরে ঘিরি ধরি বাহার করলাম। সবাই পেলাম কিছু আমার ঘরে তেরোজন মানুষ, হল পনেরো বিঘা। দু বছর কেউ ভাবল না কিছু। জবরদস্তি পরতাপের লোক ফিন ভি কাড়ি লিয়েছে। আমার জমিন ? না। আইন ভি জানি, লঢ়াই ভি।

হকের জন্যে লড়াই কর ?

না করতে ভি কাড়ি লিছে সব। ই সকল সানথালের জঙ্গল হাসিলি জমিন। কুথা গেল সব ? লঢ়াই না করতে ভি নিছ।

তাতে লঢ়াই করি হকটো ছাই।

তুমি তো ভালোই আছ।

তা আছি।

তোমার সমাজের সকলের চেয়েই ভালো আছ।

বলি যাও বাবু।

গত দশ বছরে তোমরা কোনো আন্দোলনেও ভিড়ে পড় নি। কেন তা বলতে পার ? কি মনে হয় ?

সকল কথার জবাব দিব। আরো বল।

তোমার সমাজেও কমজনই নেমেছে আন্দোলনে। বেশিজনই নামে নি। লেখাপড়া শিখছে যারা। তারাও সরে যাচ্ছে সমাজ

থেকে। তারা নিশ্চয় আন্দোলন চায় না কেন? তা হলে কোন পথে তোমাদের হক পাবে বলে মনে কর?

কি বলব? কুন কথাটা?

তোমাকে দেখেই বোঝা যায়। এমন কি সাঁওতাল নেতা বসাই টুডুর আন্দোলনের কোনো ছাপই পড়ে নি সমাজে। মানে তোমাদের সমাজে। তাই নয়?

যি নামটো বার বার উঠালে। উ নামটো অত সহজে উঠাবার নয়, জান? কে তুমি? চোখে চশমা। হাতে মেশিন। আসি তুমরা ফটাফট তাহার নাম শুধাও? কেনি? না না কুনো কথা বলব নাই। তখুন লকশালীটো হচ্ছে। টুডু ডাক দিছে সবে মোরাদের— তখুন ভি বাবু আসছিল একটো। ভালো মুখে কথা শুধায়, পুলুশরে পাত্তা চালায়।

আরে, পুলিশের লোক নই আমি।

না, না না—পবন মাথা নাড়ে দু দিকে। বলে, এখুনি বললা আমি ভালো আছি সব সমাজ হতে! কেনি বললা? মোর সাথ সবে জমিন নিছিল, ডরে-মারে-তামনে সবে ছাড়ি দিছে—ফিন দখল লিব? যতদিন না হচ্ছে কামটো, খাইখরচা বাবদ মোর জমির ফসল ধর্মগোলা করি রাখছি। এ—ই বাবু জানে, সোবেন রাখছে এক ভাবে, মোরা রাখি আর ভাবে—লিখাই পঢ়াই সানথাল ভি সামাজের কথা চিন্তে। জরুর চিন্তে। লঢ়াইয়ে সামিল? কে হয় নাই। কে মার খায় নাই। কুন হিসাবে কথা বল তুমি?

কিন্তু—

আমি ভি নাইন ক্লাস পড়েছি—তুমারদের ইস্কুলে। মার খেছি বহোত, আর এখুন বুঝি সকল!

দ্বৈপায়ন নাচার হয়ে ফিরে এসেছিল। সে রাতেই অপমানিত। প্রত্যাখ্যাত দ্বৈপায়ন ইন্দ্রকে ওর গবেষণার বিষয়টি বলে। অন্য সময় হলে বলত না। কিন্তু প্রথমে মাধব ও পরে পবনের কাছে

অপমানিত হওয়ার অভিজ্ঞতা ওর জীবনে এ লাইনে প্রথম অভিজ্ঞতা। বহুকাল আগে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময়ে সাঁওতালদের গোপন জীবন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ও গিয়েছিল এক সাঁওতাল বিয়ের সভায়। সেখানে ও যখন কালো মানুষদের নাচ-গানের মধ্যে ডুবে যাবার মুখে তখন এক বুড়ো বলেছিল, জোতদারের মাথা কেটে এসেছি বলে নাচগানের জলুস বেড়েছে।— তখনি ও ভয় পায়, ভীষণ ভয়। আতঙ্ক সাঁওতালদের বিষয়ে। এদের মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না। ভীষণ ভয়।

এই ভয়, এই অবিশ্বাস ওর ভিতরে ঢুকে গেছে।

আর, দ্বৈপায়ন বহুকাল মানুষের, সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসে না। সামন্ত, গোরা বা ইন্দ্র। এদের সংস্পর্শেও অস্বস্তি হয় তার। মাধব, পবন, সেই ভাতুয়া ছেলেটা। মাটির এই প্রত্যক্ষ সন্তানগুলির সাহচর্যে ওর অস্বস্তি অনেক বেশি।

দ্বৈপায়ন মেশে ওর মতো কৃত্রিম মানুষদের সঙ্গে। সেখানে ও দীর্ঘকাল ধরে শুনে আসছে ও অসামান্য পণ্ডিত। বিশাল পড়াশোনা ওর। সে জগতে ও শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছে। শ্রদ্ধায়, সম্মানে, প্রশংসায় ওর অভ্যেস জমে গেছে। এই সব কিছু মিলে মিশে, ওর বিশ্বাস জমেছে নিজের উপর।

প্রথমে মাধব, তারপর পবন, ক্রুদ্ধ কালো থাবায় ওর আত্মবিশ্বাসের মেকি আবরণ, অসত্যের খোলশ ছিঁড়ে দেয়। বাতিল করে দেয় ওকে। আর যেহেতু দ্বৈপায়ন ফুটো কলসি। পাণ্ডিত্য বা ব্যক্তিত্ব, সবই ওর ধার করা ব্যাপার। নিজের বলতে কিছু নেই—সেহেতু ও বেজায় দুর্বল হয়ে পড়ে। আত্মবিশ্বাস টলে যায়। মনের এই অবস্থা না হলে ও ইন্দ্রকে কথাগুলি বলতো না।

মনের এ অবস্থা হতেও বলতে পারে নি প্রথমে। বৈরাগীর ঘরে ফিরে ধোঁয়াটে লণ্ঠনের আলোয় চাটাই দেখে নতুন করে নিশ্বাস ফেলেছিল। তারপর বলেছিল, হুইস্কি খাবে একটু?

না।

আমি খাব।

খান।

গেলাস ?

এদের গেলাস-টেলাস থাকে জল খাবার জন্যে। আপনার ফ্লাস্কের গেলাসে খান।

তাই খাই।

নির্জলা খাবেন ?

জল পাব ?

এসে থেকে কি জল পান নি ? আপনি একটি জিনিস বটে! গ্রামগঞ্জে আসার বাই চাগে কেন ?

আমি খাব না কিছু।

ওদের বলে আসি সে কথা।

বৈরাগী খুব অবাক্ হয় না। নিচু গলায় ইন্দ্রকে বলে, অসুবিধে হচ্ছে ওনার ; কি করি বল তো ?

কিছু করবেন না।

কয়েকটা ল্যাঠা মাছ পেয়েছিলাম।

আমরাই খাব। একটু জল চাই।

জল খাবে ?

না, উনি মদ খাবেন।

মদ···মানে···

কিচ্ছু ভাববেন না বৈরাগীদা। আমি আছি।

ইন্দ্র জল নিয়ে যায়। দ্বৈপায়ন তার বিছানা পেতে ফেলেছে! ইন্দ্র জল দেয়। গা রি রি করে ওর। তবু চায় মদ খাক ও। মদ খেলে ঝেড়ে কাশবে। পুলিশ নয়। কোনো বিভেদী দালাল। নকশাটা জানা দরকার। তারপর ব্যবস্থা। অনেক, অনেক ব্যবস্থা বাকি। সামন্ত একে ইন্দ্রের ঘাড়ে চাপাল কেন ? একে নিয়ে

ইন্দ্র ঘুরছে, এ কি করতে এসেছে ? হয়তো অত্যন্ত গোপন কোন কাজ। কি কাজ ?

দ্বৈপায়ন একটি চ্যাপটা বোতল বের করে ও খোলে। সুদূর অতীতে দিল্লির কোনো কাচঢাকা নিঃশব্দ ঘরে সানি বজ্রপাণি বোতলটি দিয়ে বলেছিল : উইথ মাই উইশেস।

অসহ্য, অসহ্য এই কৃষক কর্মীর গরিব ঘর, মলিন চাটাই, বেড়ার দেয়ালে বাংলা ক্যালেণ্ডার। দ্বৈপায়ন কবে যাবে সানির ঘরের শীতাতপনিয়ন্ত্রণে ? কবে দেখবে দেয়াল জোড়া ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের ছবি বেনাজিরের আঁকা। চামড়ার কুশনে গা ডুবিয়ে বসে চুমুক দেবে স্কচে, মাঝে মাঝে তুলে নেবে রোস্ট করা চিতল হরিণের টুকরো ? সানির বাড়িতে আদিবাসী ডিনারের সময়ে কাচের দেয়ালের ওপারে হাজার লক্ষ আলো জ্বেলে সকৌতুকে নয়াদিল্লি হাসে। ঘরে দ্বৈপায়নরা বাইসনের শিঙের খোলে ভরে ছাঙ খায়। রাক্ষসে বাঁশের চোঙে বুনো শুওরের মাংস ভরে চোঙটি মাটি মাখিয়ে কাঠ-কয়লার চুল্লিতে ঢুকিয়ে রান্না করা হয়। একবার কাঁচা শালগাছের ছালে জড়িয়ে মাংস রোস্ট করা হয়েছিল। সানির বাড়ির 'আদিবাসী সন্ধ্যায় আসুন' এক অসামান্য ব্যাপার। সেখানে কবে যাবে দ্বৈপায়ন আবার ?

হুইস্কি খেয়ে, আবার খেয়ে তবে দ্বৈপায়ন ইন্দ্রকে বলতে পারল, আমি প্রমাণ করে দেব, সাঁওতালরা মোটেই লড়াকু নয়। বুঝেছ হে ছোকরা ? সাঁওতালদের অনেক সহজে প্রলোভন দেখানো যায়। বদলে দেওয়া যায়। সেজন্যে…

ইন্দ্র শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে সব যেন পরিষ্কার হয়ে যেতে থাকল এবার। একবার শুধু ও আস্তে বলল, সামন্তদা শুনে-ছিলেন কথাটা ?

নিশ্চয়।

বলুন ?

সামন্ত জানত। জেনেই ইন্দ্রকে পাঠিয়েছিল।

অনেক, অনেক পরে ইন্দ্র বলল, চরসা যাব।

কেন?

সবচেয়ে লড়েছে একসময়ে।

হ্যাঁ। ঠিক বলেছ।

সাঁওতালদের আপনি ঠিকই চিনেছেন তা হলে?

তুমি বুঝতে পারছ না। আদিবাসী সমাজের আদিম ঐক্যবন্ধন জিনিসটা কি বিপজ্জনক। 'দে ডিভাইডেড, উই স্ট্যানড। দে ইউনাইটেড, উই ফল।'

পরদিন ইন্দ্র দ্বৈপায়নকে চরসা নিয়ে যায়। হাটুরে গরুর গাড়ির, ইটের লরি, হাঁটা পথ। সোরেনদের বাড়ি। দোতলার গড়িয়ে পড়া ক্লান্ত, ক্লান্ত দ্বৈপায়ন।

ইন্দ্র সোরেনের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। অনেক অনেকক্ষণ কথা বলেছিল ওরা। তারপর সোরেন বলে, আমার হাতে ছাড়ি দাও।

তারপর?

তোমার কি মনে হতেছে?

আমি জাগুলা যাব।

কেনি?

সামন্তদাকে জবাব দিতে হবে। সে জানত এ কি জন্যে এসেছে, কি প্রমাণ করতে চায়। বাংলা কাগজে বেরোত লেখাটা। দুয়ে দুয়ে চার হত তোমাদের মনে। আমাকেও বেইমান মনে হত।

তার বাদে?

একদিন তুমি যা বলেছিলে?

কি?

তোমার পথ আলাদা, আমার পথ আলাদা। কোথায় কোথায় আলাদা তো আমি জানি, তুমি জান, কেননা এই কথাটাই এতদিন শুনেছি। হয়তো আলাদার ব্যাপারটাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

এখন আমাদের দেখতে হবে, খুঁজতে হবে, কোথায় কোথায় আমরা এক হতে পারি, এক হয়ে আছি। হয়তো এক হয়ে আছি, নিজেরা জানি না। জানতে হবে সোরেন, জানতে হবে।

জানলে, তা বাদে।

কাজ করতে হবে। কিছুই করা হয় নি।

না।

স-ব কাজ বাকি।

হাঁ ইন্দ্র। কিন্তুক—তোমার দল ?

সব ভাবতে হবে নতুন করে।

হাঁ।

কথা বলতে বলতে ওরা নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল। ইন্দ্র বলল, সব প্রাচীন শোষণের কাঠামো অব্যাহত রেখে বাইরে থেকে পলেস্তারা মেরে কাজ হয় না।

তুমি বুঝি দেখ।

বুঝে দেখছি, দেখব।

উয়ার কথা কি বলবে ?

ইন্দ্রর চোখ ধূসর হল। ইন্দ্র ঈষৎ হেসে বলল, আমি তো বলব উনি নিজে কোথায় রওনা দিলেন, জানি না। তারপর ফিরলেন ভালো, না ফিরলে আমি কি করব ?

না, তোমার আমার কিছু করার নাই।

চলি। ফিরলে উপরের ঘরটাই পছন্দ আমার।

ইন্দ্র চলে যায়, চলে যায় পেছনে না ফিরে। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে যা দেরি। সিদ্ধান্তে পৌঁছলে ?

সোরেন ফিরে আসে।

দ্বৈপায়নের ঘুম ভেঙেছিল বিকেলে। তারপর চা খেয়ে ও সোরেন ও উদ্ধবের সঙ্গে বেরোয়। নদী পেরিয়ে বনভূমি। সোরেন ওকে বসাই টুডুর পঞ্চম আশ্রয়, বটগাছের গুহা দেখাবে। সোরেন

ওর সকল কথা শুনে গিয়েছে নীরবে। মনে প্রফুল্লতা।

সোরেন ওকে নিয়ে বনের মধ্যে ঢোকে, ঢুকতে থাকে। বহু পথের পর ওরা পৌঁছয় এক বিশাল বটগাছের কাছে। ঝুরি নেমে নেমে এক গুহা যেন।

ও পাশে কি ?

নদীর সোঁতা ছিল। খাদান হই গিছে।

খাদান।

হাঁ, কুয়ার মতো গাহাঢ়া।

এখানে কি সেই ?

চুপ !

সোরেন কান পেতে কি শোনে। তারপর বলে, উদ্ধব ! ঢিল ফেলা খাদানে একটো ?

উদ্ধব ঢিল ফেলে।

বহোত গাহাঢ়া।

হ্যাঁ। চল !

বস টুনি। হাঁটছ বহোত। ই জায়গাটো দেখ। কালীবাবুরে মারে ইখানে, লাহাশ ফেলি চলি যায়। উদ্ধবের বাপ বেতুল কাওরা হাড় লয়ে বাঁধ ছিল চাদরে—তারেও মারি দেয়।

হ্যাঁ, তখন···মানে···

সোরেন আস্তে আস্তে বলে, সানথাল ভিতু ! সানথালরে সহজে কিনা যায়, কি বল, হাঁ ?

আমি—

অ্যানেক শুনলম। বাবা তিলকা মায়ঝির নাম ভুলি গেলে। সিদো-কানহুর হলটো জান ? সানথাল লৌ দিল। তেভাগা হল। সানথাল লৌ দিল সবার সাথে। লকশালীটো গ্রাম ছাড়ি শহরে যায় নাই—পুলুশে মেলেটারিতে সানথাল গ্রাম ছারখার করি দিল—বসাই টুডু লড়াই উঠলে সানথাল লয়ে, সি ভি ভাসি গেল।

এখুন লিখি প্রমাণ রাখি যাবে যি সানথাল সকল দিকে ডরপুক। ভালো! কিন্তুক কেনি?

এ তো তুমি বুঝতেই ভুল করছ…

বাবু! পুলুশ-মেলেটারি চিনা যায়। তারা বন্দুক লই আসে। কিন্তুক আদিবাসীর বন্ধু সাজি আস। ই তোমরা কারা? শিক্ষিৎ সানথালে লেংটা ফকির সানথালে বিভেদ চাহ। বিভেদ চাহ সানথালে অন্য আদিবাসীতে, এরে প্রমাণ কর ডরপুক, উয়ারে প্রমাণ কর বীর—তা আদিবাসীর সকল তো কাড়ি নিচ্ছ। এখুন ই বিভেদটুকু এত দরকার পড়ি গেল।

না, না না—তা নয়—

বসাই টুডু গিরা পাঠাচ্ছে, তা জান?

না, এ কি বলছ, সে মরে গেছে—

সি মরে না তা জান না? গলায় তুবায়দের ফাঁস যখুন চাপি বসে আদিবাসীর, লেংটা কাঙালের, ডম কাওরার, তখুন তার গিরা চলি যায়। আ! গিরা ভেজি সে জানাই দেয়, জান তা? না বাবু, উঠি যাবে কুথা? হাঁট, পাছু হাঁট, হাঁট! পাছু হাঁট—মোরে দেখ ভালো করি? কান্দ কেনি? চাহ, দেখ চক্ষু ভরি, কি দেখ? বসাই টুডু আসি গিছে আমার মাঝে, দেখ! হাঁট!

এবং সোরেন চেঁচিয়ে ওঠে শুওর তাড়াবার চিৎকার সগর্জনে, হ র র র র—এবং দ্বৈপায়ন ভীষণ ভয়ে দৌড়তে চেষ্টা করে—হঠাৎ সব আবছা, চশমা খুলে নেয় সোরেন—বুকে ঈষৎ ধাক্কা—না-আ-আ চিৎকার খাদানে গড়িয়ে পড়া—নিচে, আরো নিচে—খাদানটি সোজা নেমে হঠাৎ বেঁকে ঢুকে গেছে—পড়ে গেলে ওঠা অসম্ভব—নিচে পাথর—কোথাও অতলে একটা ভারি জিনিস পড়ার শব্দ হয়। দু হাত ছড়িয়ে সোরেন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, দাঁড়িয়ে থাকে। এ আমি কি করলাম? কি বললাম? ভেতরে কি যেন কাঁপে। এখন ওকে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ মনে হয়। অন্য ভূমিকা ওর, অন্য

দায়িত্ব সে ভূমিকার। বসাই টুডুর সংগ্রাম যে প্রতিপক্ষের সঙ্গে, সে শত্রুকে চেনা ছিল সোজা। সে প্রতিপক্ষ আজও আছে। এখন আরো নতুন নতুন প্রতিপক্ষ, বহু মোর্চায় একই সঙ্গে সংগ্রাম। সংগ্রাম চালাতে হয় সংগ্রাম ফুরায় না কখনো, বসাই টুডুর গিরা গিরা পাতার মর্মরে সেই কথাই বলতে থাকে।

সোরেন হাত নামিয়ে নেয়। চশমাটা ফেলে দেয়, খাদানে। উদ্ধবকে বলে জিনিসগুলা কেনি যাব কাল।

হেথায় লয়, হো—ই উধার।

বন ভেঙে ফিরতে থাকে ওরা। দ্বৈপায়নের নিখোঁজ হবার ব্যাপারে ঝামেলা হতে পারে—তার মোকাবিলা আছে। ইন্দ্র ফিরে এলে করতে হবে কাজের প্রোগ্রাম। নিজেদের সংগঠিত করতে হবে। সিদো-কানহুর হুলের গানটা বাঁধা হয় নি মনের মতন। নদীর চরে নামে ওরা। বালি ভেঙে চলতে চলতে সোরেন বলে, শালো খোচর কাম করতে আসছিল।

বালির পর জল। মুখ তুলতে আকাশের গায়ে চরসা গ্রাম ভেসে ওঠে। চলতে চলতে সোরেন বলে, তোরে বুঝি বলি নাই উদ্ধব। হুল-এর কালে সিদো-কানহুর সাথ সকল ডমবাউরি আনজাত সামিল হচ্ছিল।